

জীবন-শিল্পী কৃষণ চন্দর

"সন-তারিখ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে তখন ছিল শীতের রাত। পাহাড়ী অঞ্চলের রাত মানে চারদিকে মৃত্যুশীতল নীরবতা। আমরা শুয়ে আছি এমন সময়ে জোরে কে যেন দরজার কড়া নাড়ালো। পিতাজী ছিলেন ডাক্তার। কড়া নাড়া শুনে তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন। বাইরে টেলিগ্রাফ পিয়ন এসেছিল। পিতাজী ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় টেলিগ্রাফ পড়ছিলেন; তাঁর হাত কাঁপছিলো। তারপর পিতাজী মাতাজীর কাছে এলেন। জানিনা কি বললেন। কিন্তু মাতাজী চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তাঁর চিৎকার শুনে আমরা সবাই ছুটে গেলাম, দেখলাম তিনি কাঁদছেন। তখন আমরাও কাঁদতে লাগলাম। সারা ঘরে হৈচৈ পড়ে গেল।

"রাত পোহালো। সব কিছু ফিকে অসুন্দর মনে হলো। চারদিকে অদ্ভুত রকমের নিরানন্দময় পরিবেশ। যেখানেই যাই আমাদের একে অন্যকে দেখিয়ে লোকে কি যেন বলাবলি করে। সবাই কানাঘুষা করে। দুপুর নাগাদ সমগ্র পুঞ্চ-এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, ডাক্তার সাহেবের বড় ছেলে কৃষণ চন্দর বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে, সে এখন লাহোরে নেই।

"লোকজন বলাবলি করছে, 'আরে পালাবে না মানে! গল্প লেখে গল্প! প্রেমের গল্প! দেখলে না কিছুকাল আগে লাহোর থেকে কি রকম রং বদলে এসেছে। নাটক করে গল্প শোনায়, কবিদের মজলিসে যায়। দু' সপ্তাহ ধরে হৈ-হল্লা। কাউকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবেনা, যেন পাড়া মাথায় তুলেছে।'

"এ দিকে আত্মীয়-স্বজনেরও সুযোগ এসেছে, তারা মনের ঝাল মেটাচ্ছে। বলছে, 'আরে সেয়ানা ছেলে, দেখ কোন মেমটেম নিয়ে পালিয়েছে। একা যায়নি।'

"কিন্তু কৃষণজী পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়েও পালাননি বা কোন মেম নিয়েও নয়। এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করেছিলেন। এ জন্য তিনি পিতাজী কি বলবেন ভেবে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। হোস্টেল ছেড়ে তিনি কলিকাতা চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময়ে হাতের সোনার আংটিও রেখে গিয়েছিলেন।

"কিছুদিন পরে কৃষণজী মায়ের অসুখের কথা শুনে ফিরে এলেন। মা তাঁকে বললেন, 'বাবা গল্প লেখা ছেড়ে দাও, মন দিয়ে লেখাপড়া করে এম. এ. পাস করো। ওকালতি করো, জজ হও, দেশের নাম উজ্জ্বল করো।'

"কৃষণজী সাথে সাথে জবাব দিলেন, 'এম, এ পাস করবো, ওকালতিও পাস করবো কিন্তু জজ হবো না, গল্প লেখাও ছাড়বো না।"—

কৃষণ চন্দরের ছোট বোন সরলা দেবী তাঁর ভাই সম্পর্কে উপরোক্ত ঘটনা লিখেছেন।

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে কৃষণ চন্দর সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম তো বটেই, সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন।

সমগ্র উর্দু সাহিত্যে তাঁর মত জীবনবাদী প্রগতিশীল লেখকের সংখ্যা হাতে গোনার মতো। ছোট গল্প, নাটক, শিশু-সাহিত্য, ব্যঙ্গ রচনা এবং উপন্যাসে তিনি মূলত সাহিত্য সাধনা করেছেন; কিন্তু জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ভাষার পারিপাট্য, বর্ণনার সাবলীলতায় তাঁর প্রতিটি লেখা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। প্রগতিশীল উর্দু কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মুনশী প্রেম চাঁদ, ফয়েজ ফয়েজ, আহমদ খাজা আহমেদ আব্বাস, সাদত হাসান মান্টো, রাম লাল, রামেন্দ্র সিং বেদী, শওকত সিদ্দিকী, মহেন্দ্রনাথ, ইব্রাহীম জালিস, আহমেদ নদীম কাসেমী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের কারো সাহিত্য-সাধনায়ই কৃষণ চন্দরের মতো এতো ব্যাপক জীবনবোধের-উজ্জ্বল স্বাক্ষর নেই। প্রতিটি লেখার প্রায় প্রতিটি ছত্রেই কৃষণ চন্দরের মতো এতো উপমা ব্যবহার, বাচনভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য অন্য কারো লেখাতেই চোখে পড়ে না।

১৯৭৭ সালের ৮ই মার্চ মঙ্গলবার উর্দু সাহিত্যের এই প্রথিতযশা লেখক লোকান্তরিত হন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সের সময়ে কাশ্মীর চলে যান এবং জীবনের একটি প্রধান অংশ সেখানে অতিবাহিত করেন। লাহোরে লেখাপড়া করেন এবং ফারমান ক্রিশ্চান কলেজ থেকে এম. এ. পাস করেন। এম. এ. পাসের পর কিছুকাল রেডিওতে

চাকরি করেন তারপর চলচ্চিত্র জগতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু চিত্র-পুরীর পরিবেশের সাথে তিনি নিজেকে বেশী দিন খাপ খাওয়াতে পারেননি।

তেইশ বছর বয়স থেকে তিনি গল্প লেখায় পুরোপুরি আত্ম-নিয়োগ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর লেখার প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সব সময়ে তিনি জীবনের সমস্যাভিত্তিক বিষয় নিয়ে গল্প লিখতেন। তাঁর মনে এ-বোধ কাজ করতো যে এ সব সমস্যা কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হয় এর সমাধানই বা কোন্ পথে।

একবার এক সাক্ষাৎকারে কৃষণ চন্দর বলেছেন যে, মীর্জা আসা-দুল্লাহ্ খান গালিব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুন্সী প্রেমচাঁদ, চেখভ, বালজাক, টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী, ভিক্টর হুগো, শেক্সপীয়র প্রমুখের লেখা থেকে তিনি গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তাঁর 'সিকাস্ত' (পরাজয়) এবং 'আনদাতা' (অন্নদাতা) নামক উপ-ন্যাস দু'টি অসম্ভব রকম জনপ্রিয়তা লাভ করে। উপমহাদেশে তিনি সব চেয়ে অধিক সংখ্যক গল্পলেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের পাঠকদের কাছে কৃষণ চন্দর সমান-ভাবে জনপ্রিয় লেখক। তাঁর একটি বড় গুণ হলো তিনি কখনো লেখা ছেড়ে দেননি, একই ভাবে লিখে এসেছেন। শুধু এ উপ-মহাদেশে নয় বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহু ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। বহু বছর পূর্ব থেকেই এলাহাবাদ ও বার্লিনে কৃষণ চন্দরের সাহিত্য-কর্ম বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা কৃষণ চন্দর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সিকাস্ত' মাত্র বাইশ দিনে রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করে বহু ভুয়া প্রকাশক হাজার হাজার টাকা মুনাফা করেছে। তাঁর নামের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু আনাড়ী লেখকের রচনাও তাঁর নামে চালিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, কৃষণ চন্দর এতো বেশী লিখেছেন যে, তিনি নিজেও তাঁর সব বইয়ের নাম জানতেন না বলে শোনা যায়। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস সমূহের কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি চিত্রায়িত হয়েছে এবং সব গুলোরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এক আওরত হাজার দিওয়ানে, কালা-সুরুজ, তুফান কি কলিয়াঁ, হামঅহশী হ্যাঁয়, এক গাদহে কি সরগুজাশত, আসমান

রওশন হ্যাঁয়, সড়ক ওয়াপেস যাতি হ্যায়, নয়ে গোলাম এক রুপিয়া, নগমে কি মওত, তিন গুণ্ডে, অজন্তা সে আগে, উল্টা দরখত, হাওয়াই কিল্লা, মালারানী, লণ্ডনকে সাত-রং, গাদ্দার, মাঁয় এন্তেজার করোঙ্গা, সুবেহ হোতি হ্যাঁয়, পাওদে, এক গীর্জা এক খন্দক, সমন্দর দূর হ্যায়, তলসমে খেয়াল, বাওন পাত্তে, এক খুশবু উড়ি উড়ি সি, নয়ে আফসানে, জিন্দেগী কে মোড় পর, দেলকি ওয়াদিয়াঁ সো গেয়ী, উল্টা দরখত, যব খেত জাগে, এক ফুল, কিতাব কা কাফন প্রভৃতি। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষণ চন্দর নেহরু পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

কৃষণ চন্দর ছিলেন একজন জাত শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে তাঁর ছোট বোনের 'কৃষণজী' শীর্ষক উর্দু ভাষায় প্রকাশিত রচনার আরও কিছু অংশ তুলে দেয়া যাচ্ছে। এতে করে এই মহান সাহিত্যিক সম্পর্কে এমন বহু তথ্য জানা যাবে, যা বাইরের কারো পক্ষেই জানানো সম্ভব নয়।

সরলা দেবী লিখেছেন, "ছোট বেলা থেকেই কৃষণজী ছিলেন আরামপ্রিয় স্বভাবের। পায়ে হেঁটে চলা তিনি পছন্দ করতেন না। টাঙ্গায় চড়তে ভারী ভালবাসতেন। লাহোরের বাড়ী থেকে কলেজ ছিল বেশ দূরে। গাড়ী ভাড়া লাগতো অনেক। তাই মা ছোটভাই ও তাঁকে সাইকেল কিনে দিলেন। কিন্তু তাঁকে আমি কখনো সাইকেলে চড়তে দেখিনি। সাইকেলসহ তিনি টাঙ্গায় করে বাড়ী ফিরতেন। তাঁর এ অভ্যাসের আজও পরিবর্তন হয়নি। তবে টাঙ্গার স্থান দখল করেছে ট্যাক্সি। কৃষণজীর সবসময়ে ট্যাক্সি চাই। তাও সারাক্ষণ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যতো টাকা তিনি ট্যাক্সির পেছনে ব্যয় করেছেন তা দিয়ে নিঃসন্দেহে এক ডজন গাড়ী কেনা যেতো। কিন্তু সাইকেলের মতো গাড়ীও কৃষণজী পছন্দ করতেন না। মা কিছু বললে বলতেন, গাড়ী চালাবে কে, কে রাখবে পার্টস-পেট্রোলের হিসাব? ড্রাইভার রাখলে তার দিকে সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে; আমার জন্য তাই ট্যাক্সিই ভালো। যখন ইচ্ছা ডেকে নিলাম, যখন ইচ্ছা ছেড়ে দিলাম। ড্রাইভারের মেজাজ কখনো খারাপ থাকে না, যখনি ডাকো হেসে এগিয়ে আসে।

এই হাসিই আসল না কি গা বাঁচানোর জন্য জানি না তবে কৃষণজী কখনো গাড়ী কেনেননি। তাঁর প্রিয় জিনিসগুলোর মধ্যে ট্যাক্সি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ছোট বেলা থেকে কৃষণজী ও মহেন্দ্রনাথ একত্রে থাকতেন। উভয়ের মধ্যে খুব ভাব। একই প্লেটে খাবার খেতেন, একই বিছানায় ঘুমাতেন। একই সঙ্গে যে-কোন প্রোগ্রাম করতেন। কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে কৃষণজী কখনো ভাই-এর সঙ্গে সমঝোতায় আসতেন না। মহেন্দ্রনাথজী ঘুড়ি ওড়ানো যতোটা পছন্দ করতেন কৃষণজী ঠিক ততোটাই অপছন্দ করতেন। একবার ঘুড়ি ওড়ানোর সময় ঘুড়ির সুতোয় মহেন্দ্রজীর আঙুল কেটে যায়। ব্যস, কৃষণজী রাগ করার মওকা পেলেন। মহেন্দ্রজীকে মারতে লাগলেন। মহেন্দ্র-জীও পরাজয় স্বীকারের লোক নন। তিনিও জড়িয়ে ধরলেন। এক চোট হয়ে যাওয়ার পর ঘরের জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ির পালা এলো। কিন্তু শীঘ্রই লড়াই থেমে গেল। উভয়ে গলাগলি করলেন। কৃষণজী মহেন্দ্রজীর সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন আজ থেকে তোমাকে কখনো মারব না। মহেন্দ্রজীও শপথ নিলেন, আজ থেকে আর ঘুড়ি ওড়াব না।

গল্পের মধ্যে ছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কৃষণজী কখনো কারো ওপর মতামত চাপিযে দেয়ার চেষ্টা করতেন না। কারো মনে কষ্ট দেয়া তাঁর ধাতে সইত না। ভাল-মন্দ তিনি ঠিকই বুঝতে পারতেন কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব প্রকাশ করতেন না। সম্ভবত এ জন্যই তিনি জজ হননি। ছোট বেলায় মা আমাদের সম্পর্কে তাঁর কাছে অভিযোগ করতেন, কাকা ওরা কিছু বোঝে না ওদের একটু বুঝিয়ে দেতো। মায়ের সামনে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, আপনি ভাববেন না আমি ওদের ঠিক করে নেব। আমাদের কাছে এমনভাবে এসে বসতেন যেন কিছুই হয়নি। উভয় পক্ষ তাঁকে যখন শালিস মানতো তখন তিনি ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দাও---এ ধরনের কথাগুলো এমনভাবে বলতেন যেন এই মাত্র বাইরে থেকে এসেছেন।

অন্যের ব্যাপারে যেমন মতামত প্রকাশ করেননি, তেমনি নিজের ব্যাপারেও কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। তবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন; আমার উপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে বিয়ের ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন। এম. এ. পাস করে রেডিওতে চাকরি নেয়ার পর মা তাঁকে বিয়ের জন্য চাপ দিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না। কখনো বলতেন মেয়ে সুন্দরী হতে হবে, কখনো বল-

তেন ছিপছিপে গড়নের চাঁদের মতো সুন্দরী হতে হবে। পাত্রীপক্ষ এলে বৌ ভাইয়ের মানদণ্ডে টিকত না। মা লেগেই আছেন। শেষে ভাই বললেন, বিয়ে দিতে চাও দাও তবে সরলাকে অবশ্যই পাত্রী দেখাবে। আমিতো খুশীতে বাগবাগ। পাত্রী দেখলাম। ভাবী বি. এ. পাস. উচ্চবংশীয়, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু সম্ভবত আমি তাকে বাস্তবের চোখে না দেখে স্বপ্নের চোখে দেখেছি। ঘরে ঢোল বাদ্য বাজবে, ভাল জামা কাপড় আসবে, অতিথি আসবে, ভাবী এলে দারুণ মজা হবে, আমরা তাকে নিয়ে সিনেমায় যাব। এ সব ভেবে ভাইকে বললাম, ভাবী খুউব সুন্দরী, পরী একেবারে পরী।

পরী ঘরে এলো কিন্তু ভাইজানের মনের মতো হলো না। তিনি আমাকে বললেন, তুই আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিলি, তোকে কখনো ক্ষমা করবো না। কিন্তু ভাবীকে তিনি একটি কথাও বললেন না এবং নিজের মনোভাবও প্রকাশ পেতে দিলেন না। পরে অবশ্য পরিস্থিতির সাথে তিনি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। একবার আমি এক ভাই সহ তাঁর বাসায় বেড়াতে গেলাম। ভাবী আমাদের সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন ওরা এখানে পড়ে থাকে কেন? ভাবীকে খুশী রাখার জন্য ভাইজান আমাদের কাছে প্রায়ই আসতেন না। ভাবী বাইরে গেলেই এসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতেন। একদিন ভাবী ঘরে ছিলেন না। আমাকে ডেকে ভাইজান দরজা পর্যন্ত এলেন, এমন সময় ভাবী এসে উপস্থিত। ভাইজান আমাকে কিছু না বলে এমনভাবে উল্টা পায়ে ফিরে এলেন যেন এদিকে ভুল-ক্রমে এসে পড়েছেন।

আমি পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে একজনকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলে, মা আমাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কৃষণজীকে ধরে বসলেন। কৃষণজী মায়ের সামনে আমাকে বললেন, মাতো ঠিকই বলছেন, ইউপির লোকেরা বড় খারাপ, তোকে ইয়া লম্বা ঘোমটা পরাবে, চাঁদির অলংকার পরিয়ে রাখবে, একজন মানুষের মুখ দেখার জন্য ছটফট করবি। তায় আবার রেবতি পিয়াজ-গোসত পর্যন্ত খায়না, ওখানে খাবি কি?

মা চলে গেলে মহেন্দ্রজী বলতেন, দাদা আপনি আপত্তি করছেন কেন? কৃষণজী বলতেন, এবারে আমার কোন আপত্তি তো নেই। কিন্তু মায়ের সামনে কি বলব? হাজার হোক মা-তো!"

এই হলেন কৃষণ চন্দর। বড় লেখক হওয়ার সাথে সাথে তিনি হয়েছিলেন একটি সমবেদনশীল মনের অধিকারী। এই সমবেদনা বোধই তাঁকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, বড় লোকের সৃষ্ট সমস্যার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শাসক শ্রেণীর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির চুলচেরা সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অথচ এতোসব করেও তাঁর লেখার শিল্পগুণ বিন্দুমাত্র নষ্ট হতো না।

উত্তম খাবার ছিল কৃষণজীর খুবই পছন্দ। বাজে খাবার তিনি খেতে পারতেন না। এ ব্যাপারে কোন রকম অবহেলা ছিল তাঁর কাছে অসহ্য। একবার অনেক রাতে তিনি ঘরে ফিরছেন। সবাই তখন ঘুমাবার আয়োজন করছে। মা তার এক মেয়েকে বললেন, দুটো আলু তোলা আছে, তোর ভাইকে একটু ভর্তা করে দে। একথা শুনে কৃষণ চন্দর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনারা আমাকে কি মনে করেছেন? এভাবেই কি আমাকে খেতে হবে? তা হলে যাই, এক্ষুণি হোটেলে খেয়ে আসব বিশ টাকা খরচ করব। মা অনেক নিষেধ করলেন, কিন্তু কৃষণ কিছুই শুনলেন না। রাত বারোটায় চোখে চমক, মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এসে বললেন, মা পুরো বিশ টাকা খরচ করে এসেছি।

কৃষণ চন্দর টাকা খরচ করে আনন্দ পেতেন। বৃষ্টির মতো পয়সা অর্জিত হলে তিনি স্রোতের মতো বইয়ে দিতেন।

ব্যাঙ্কে টাকা জমানো তাঁর ধাতে সইত না; বলতেন টাকা আবার কি জমা করার জিনিস? টাকা হলো খরচের জন্য, ভাল খাও ভাল পরো মজাসে কাটাও। যতক্ষণ টাকা পকেটে থাকে, ততক্ষণ খুশীর সীমা থাকে না, পকেট খালি হলেই মুড খারাপ হয়ে যায়। এক হাজার টাকা থাকলে বলেন, শ'দুয়েক আছে। ব্যস, কাল পর্যন্ত চলতে পারে। পরশুর ব্যবস্থার জন্য লিখতে বসে যেতেন।

এক হাজার টাকা তাঁর কাছে একশ' বা দুশো টাকার বেশী গুরুত্ব পেতো না। দিল্লী গেলে ঘরের চেয়ে বাইরে বেশী থাকতেন। মা কিছু বললে বলতেন, কি করব মা টাকার ব্যবস্থা করতে হবে না? কিছু নেই, খালি পকেটে ঘুরছি। টাকার ব্যবস্থা হলে সে টাকা খরচ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। আজ এ হোটেলে, কাল অন্য হোটেলে। বন্ধু-বান্ধব তো লেগেই আছে। দিল্লীতে টাকা খরচের খায়েশ পূরণ হবার পর প্রথম শ্রেণীর টিকেটে বোম্বে চলে যেতেন।

স্টেশনে নেমে বই কেনার মতো, হোটেলে খাবার মতো এবং ট্যাক্সিতে বাসায় পেঁছার মতো টাকা রেখে দিতেন। তারপর কিছু থেকে গেলে সেসব ভাইবোনদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।

জীবনে বহু টাকা উপার্জন সত্ত্বেও কৃষণ চন্দরের দারিদ্র্য মোচেনি। মা তাঁকে বাড়ী করতে বলে বলতেন তোর মামাতো ভাইদের কথা কৃষণ বলতেন, ওদের গাড়ী বাড়ী আছে। তা না বলে কৃষণ চন্দর নাকি বড়লোক, এখনো একটা কুঁড়ে ঘর তৈরী করতে পারলে না। কিসের বড়লোক ? মা তাঁকে বলতেন, কাকা একটা বড় বাড়ী তৈরী করাও টাকা-পয়সা এভাবে নষ্ট করো না, ভাড়া বাড়ীতেই কি ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবে ? কৃষণজী এসব কথার কোন জবাব দিতেন না।

একবার দিল্লীতে বিল্ডিং-এর ডিজাইন প্রদর্শনী চলছিল। মা তাঁকে অনেক করে বললেন একটু দেখে আসতে, কিন্তু কৃষণজী শুনলেন না। তিষ্ঠাতে না পেরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে পরে একদিন গেলেন। মা ডিজাইন দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর কৃষণের প্রতি তাকান। কৃষণ চন্দর ডিজাইনও দেখেন না, মায়ের দিকেও তাকান না। বাইরে বেরিয়ে তাঁর মা আর থাকতে পারলেন না, ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, কাকা তুইও ওরকম একটা বাড়ী তৈরী কর। কৃষণজী হেসে বললেন, মা আপনি কোন্ বাড়ীর কথা বলছেন ? অমন কতো বাড়ীতো গ্লাসে গুলে খেয়ে ফেলেছি।

যে-কোন স্থানে বসে কৃষণ চন্দর লিখতে পারতেন, কিন্তু কাছে পিন, কালি ও উন্নত মানের কাগজ থাকতে হতো। সব সময় তিনি রাইটিং প্যাড-এ লিখতেন। তাও বাজারের সবচেয়ে সেরা প্যাডে। লেখার কলমের নিব সরু হতে হবে। মোটা নিবের কলম দিয়ে তিনি লিখতে পারতেন না। ঘরে শোরগোল হচ্ছে, এর মধ্যেই তিনি লিখে যেতেন। লিখতে লিখতে পানি খেতে চাইলেন, পানি নিয়ে রেখে দেয়া হলো কিন্তু তাঁর সেদিকে খেয়ালই নেই। দীর্ঘ সময় পর দেখা গেল পানি একইভাবে পড়ে আছে। গভীর মনোযোগের সাথে অস্বাভাবিক রকম দ্রুততার সাথে তিনি লিখতেন, কোন কিছু কেটে আবার লিখতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। লেখার জন্য শান্তি ও স্বস্তি খুঁজতে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, স্ত্রীকে খুশী রাখার জন্যও তিনি যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন।

৬২ বছর বয়সে কৃষণ চন্দর পরলোক গমন করেছেন। তাঁর এ মৃত্যুকে অকাল মৃত্যুই বলা যায়। উর্দু সাহিত্যকে তিনি আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন। তাঁর যতো লেখা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে অন্য কোন উর্দ্‌ সাহিত্যিকের লেখা ততো অনূদিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এদিক থেকে তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকরাও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তবু কৃষণ চন্দর তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুরাগীদের হৃদয়ে যুগযুগ ধরে বেঁচে থাকবেন।

এ, বি, এম, কামাল উদ্দিন শামীম

এক

অনেক দিন পর প্রভাত আজ তার মায়ের কাছে বসার সুযোগ পেয়েছে। অনেক দিন পর সে আজ আপন ঘরে সকাল বিকেল দেখছে। অনেক দিন পর আজ সে পঞ্চতারা গাছের ছায়ায় শুয়ে বসে কাটিয়েছে, পঞ্চতারা ফুলের সাথে খেলা করেছে। এই ফুল গাছের ছায়ায় সে তার দু'বছরের বোনকে নিজের হাতে কবর দিয়েছে, সে সমাধিতে পঞ্চতারা ফুলের একটি চারা রোপণ করেছে। ছোট সেই চারাটি আজ একটি সুন্দর সুশোভন গাছে রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর সে গাছে ফুল ফোটে, ফুলে ফুলে সারা আঙিনা হয়ে ওঠে ফুলময়।

'বাবলু' যদি আজ বেঁচে থাকতো তবে পঞ্চতারা গাছের সমান লম্বা হতো। পঞ্চতারা গাছের গোড়ায় পানি দেয়ার সময় মা বাবলুর কাল্পনিক উচ্চতা পরিমাপ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অশ্রুভরা চোখে তিনি পঞ্চতারা গাছের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। যেন শিশু বাবলু যুবক হয়েছে, তার হাতে মেহেদীর রং দেয়ার ভাবনায় তিনি বিভোর হয়ে আছেন। আজও মা বসে থেকে নিজেকে চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। পঞ্চতারা গাছের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অপলক। কিন্তু আজ তিনি বাবলুর কথা ভাবছেন না। বরং ভাবছেন তাঁর কোল খালি করে যাওয়া ছোট পুত্রের কথা। তাঁর ছেলে তাঁকে ছেড়ে এমন এক লোকালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেছে যার নামও তিনি শোনেননি। সে যাচ্ছে রুটি রুজির সন্ধানে। কিছু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। শুধু নিজের গণ্ডীঘেরা জগতকে জিইয়ে রাখার জন্য এতো দূরেও যেতে হয়। মা কখনো এ ধরনের কিছু ভাবতে পারেন নি। পেটে ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, সে আগুন নেভানোর জন্য এত কিছু করতে হয়। এটা মায়ের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। মা ছিলেন এক সাধারণ জমিদার ঘরের মেয়ে, সেখানেও তিনি রাজত্ব করেছেন। শ্বশুর ঘরে এসেছেন সেখানেও তিনি রাজত্ব করেছেন

যদিও রাজপ্রাসাদ মেলেনি। রানীদের সাথেও ওঠা বসা হয়েছে। নতুন সংসার শুরুতে ছিল বেশ বড়সড়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা খুবই ছোট হয়ে পড়ে। সরকারী মহলে কেউ মারা গেলে পুরনো জায়গা ছেড়ে দিয়ে দূরে কোন পাহাড়ের পাদদেশে কোন নদীর উঁচু তীরে নতুন মহল তৈরী করা হতো, কিন্তু মায়েদের ঘরে কয়েকটি মৃত্যু হলেও পুরানো জায়গার মায়া ত্যাগ করে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সবাই গিয়ে ওরা এখন শুধু মা ও ছেলে রয়ে গেছে। মহল একেবারে জনশূন্য। চিরদিনের জন, বিরান হয়ে গেছে। সেখানে যারা বসবাস করতো তারা এলাকাকে সজীব রেখেছিল কিন্তু তাদের মৃত্যুর সাথে সব নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। খাদ্য-সামগ্রী, আলো-বাতাস, জীবন-স্পন্দন সবই যেন ওদের হাতেই ছিল, ওদের মৃত্যুর সাথে সাথে চারদিকে ক্ষুধা, হাহাকার ও মৃত্যু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই ক্ষুধা ও মৃত্যু আজ এই মা ও ছেলের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। দুজনেই দারুণ ভুক্তভোগী। মা অতীতের সুদিনের কথা ভাবছেন, যে সুদিন আজ এক সর্বগ্রাসী দুর্দিনের করালগ্রাসে নিপতিত, এক নিমেষে যেন সব আলো সব হাসি-গান থেমে গেছে, আলোর ঔজ্জ্বল্য যা ছিল সব যেন ক্ষণিকের মায়া-মরীচিকা। অন্ধ-কারকে আরো ভয়াবহ আরো ঘনীভূত করে তোলার জন্যই যেন ছিল সে আলোর ঝলকানি।

এমনি সব অর্থহীন চিন্তায় মা ডুবে আছেন, পক্ষান্তরে ছেলে টিম টিম জ্বলা আলোর পেছনে নিরন্তর ছুটছে। এ ছোটার শেষ কোথায়, তার জানা নেই। মা কপালে করাঘাত করে বলছেন, এমন দুর্দিনও দেখা তাঁর কপালে ছিল ?

উদাস কণ্ঠ ছেলের, আমার শুধু এই দুঃখ যে কেউ আমাকে চিনতেই পারল না। অনেক খুঁজলাম কিন্তু ছোটখাটো একটা কাজও কোথাও পাওয়া গেল না।

এতো পড়ালেখা করলে---যদি আমার রাজা আজ জীবিত থাকতো তবে শহরের শাসনকর্তা হতো। বলতেন মা অনেকটা খেদের সঙ্গে।

রাজা যদি জীবিত থাকতো তবে আমি কি আর এতো লেখাপড়া করতাম ? এতোদিনে কতো জায়গা-জমি মিলে যেতো। বাবার মতো আমিও আরাম করতাম। কী যে মজা হতো ! একদিন

নিঃশব্দে মরে যেতাম। কতো সহজ সরল ছিল তাঁর জীবন, কতো শান্তির মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন।

মা চুপ করে রইলেন।

গতকাল রাস্তায় চৌধুরী রতন সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।---প্রভাত কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল।

কি বলল ?

আমাকে দেখে যেন ছটফট করে উঠলেন।

কেন ?

সম্ভবত মালারানীর বিয়ে দিয়ে তিনি খুব আফসোস করছেন।

তোমার বিয়েতো শৈশবেই হয়ে গেছে। তিনি স্বয়ং আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তোমার মধ্যে কিসের অভাব আছে যে আফসোস করতে হচ্ছে ?

এখন আছেই বা কি আমাদের ? জমি নেই, সম্পদ সম্পত্তি নেই। একটা মাত্র ঘর আছে যেটাকে রাজাও সঙ্গে নেয়নি, পূর্বপুরুষরাও নয় সম্ভবত এর দেয়ালগুলোই ধরিত্রীকে ছাড়তে পারেনি। না হলে এটাকেও নিয়ে যেতো। কিন্তু এখন জানা গেল যে এ ঘরখানাও ঋণের দায়ে বাধা। অন্যদিকে চৌধুরী রতন সিং জীবিত, ঘরখানা তাই অক্ষত। জায়গা-জমির অবস্থাও তথৈবচ।

পৃথিবীতে বাড়ীঘর, অট্টালিকা, জায়গা-জমি, ভূ-সম্পত্তি সব কিছুই বংশগত আভিজাত্য নয়।

আজকাল যার কাছে ধন-দৌলত রয়েছে সেই মর্যাদার অধিকারী।

রতন সিং না হোক মালার মায়ের সঙ্গে দুচারটে কথা অবশ্যই বলব।

এখন কি ভিক্ষা চাইবে ?

ভিক্ষা কেন ? মালাতো তাদের কাছে আমাদের আমানত, গচ্ছিত সম্পদ বৈ নয়।

বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীর হয়ে যায়, তাছাড়া তোদের বিয়ের ব্যবস্থা তো গোপনে হয়নি। সারা শহরের মানুষ এসেছে, হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কোন সাক্ষী জীবিত থেকে থাকলে আমি তাকে হাজির করতে পারি।

মায়ের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। ক্রোধে তিনি কাঁপছেন। কিছুক্ষণ আগেও তিনি ছিলেন চুপচাপ। তাঁর একমাত্র পুত্র রুচির

সন্ধানে দূরান্তরের পথে কাক-ডাকা ভোরে পাড়ি জমাচ্ছে। সে এতো দূরে যাচ্ছে যেখানে কল্পনার রথে চড়েও তার পক্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়।

অল্পকালের মধ্যেই নীরবতার বাঁধন টুটে গেল, দারিদ্র্যের অনুভূতি লোপ পেল এবং বংশগত আভিজাত্যের সুপ্ত নিদর্শন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রভাত অনেক অতীতে চলে গেছে, চৌদ্দ বছর পেছনে, সে তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তো, মালার সাথে যখন তার বিয়ে হয়েছিল।

আঙিনায় এক বিরাট শামিয়ানা টাঙ্গানো। আশপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ছোট-বড় রঙ-বেরঙের বিজলী বাতির রোশনাইয়ে। একদিকে রাজা সাহেবের মোসাহেব ও কর্মচারীরা বসে আছে, তাদের মধ্যে পিতাজীও রয়েছেন। মাঝখানে সামরিক অফিসার ও তাদের গিন্নিরা সমাসীন। তাদের আশেপাশে শহরের বিশিষ্ট অভ্যাগতরা। সবাই চেনা জানা। স্কুলের আশেপাশে প্রায়ই যাদের সঙ্গে দেখা হয় রাজা সাহেবের সাথে কথা বলতে দেখা যায়। এরা এমন সব ব্যক্তি যাদের সে কোথাও না কোথাও অবশ্যই দেখেছে। সবাই তাকে নিজের কাছে ডাকছে। জীবনে এই প্রথম সে এতো লোককে একত্রে মদ খেতে দেখেছে, দেখেছে প্রথমবারের মত সিগারেটের এতো একত্রিত ধোঁয়া।

প্রত্যেক মাসের প্রথমে দাদী আম্মা ব্রাহ্মণদের যেখানে রুটি খাওয়ান, সাদা চাদর বিছানো সে জায়গায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা বসে আছেন। বৃদ্ধা ও আধবয়েসী মহিলারা দেয়াল ঘেঁষে বসেছেন। যুবতী ও অল্পবয়স্কা মেয়েরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি বসেছে। উভয় দলের কাছে একটি করে বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। গানের তালে তালে পরস্পরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রশ্ন করার পর চারদিক নীরবতায় ছেয়ে যায় এবং পরমুহূর্তেই জবাব দেয়ার পর মিলিত অট্টহাসির রোল ওঠে। বৃদ্ধা ও আধাবয়েসী মেয়েরা বারবার ভক্তিরসের গান ও ভজন গাওয়ার আদেশ দিচ্ছে কিন্তু যুবতী ও অল্প বয়েসী মেয়েরা প্রেমের গানের রসেই বিভোর। তারা খুবই মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে নিজ নিজ প্রেমিককে গানের ভাষায় আহবান জানাচ্ছে। প্রেমিককে তারা আজো দেখেনি, হয়তো কোন দিনই দেখবে না। গানের ভুবনের কল্পিত প্রেমিক তাদের কাছে হয়তো কোনদিন ধরা দেবে না

তবু তারা সেই অনাগত প্রেমিকের স্বপ্নে বিভোর। তারকারাজীর উদ্দেশ্যে আঁচলের সুরভি ছুঁয়ে দিচ্ছে। নিষ্পাপ কুমারী চোখে প্রেমিকদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে আধখোলা কলির উপঢৌকন।

কানামাছি খেলা প্রভাতেরও খুবই পছন্দ। আলো-আঁধারের রহস্যঘন পরিবেশে সাথীদের নিয়ে সে কানামাছি খেলে। এ খেলা তার রোজকারের খেলা। আজো এ খেলায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা তার মনে প্রবল। কিন্তু আজ সে সবার চোখে চোখে থাকছে। নিজেকে লুকোবার জন্য কোন গোপন জায়গা সে খুঁজে পাচ্ছে না। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সে মালাকে দেখতে পেল না। মালার হাসিমাখা মুখ তার চোখে পড়ল না একটি বারের জন্যও।

মালা আসবে না? মায়ের কাছে প্রভাত জিজ্ঞেস করে। মা স্বর্ণালংকার পরিধান করে এমনভাবে সেজেছেন যে, তাঁর চেহারাও ভালভাবে দেখা যায় না।

তার কথায় সবাই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। সেখানে সবাই আছে নেই শুধু মালা। মালার মা বড় চাচীও নেই, মালার বাবা রতন সিংও নেই। সবকিছু তার কাছে কেমন ফিকে মনে হচ্ছে। খেলার সাথীরা অতিমাত্রায় হৈ চৈ শোরগোল করছে। মেয়েরা মিষ্টি সুরে গান গাইছে। তারা সুযোগ পেলেই প্রভাতকে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয়, কাতুকুতু দেয়। হাসতে হাসতে কান্নার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে ছাড়ে। এহেন উত্তেজনাকর পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে প্রভাত ছাদের উপর একটা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে।

সামনের সারি সারি গাছ থেকে পাখীরা উঁকি দিচ্ছে। ওপর থেকে দূরে সমুদ্রের জলরাশি দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে মেজর সাহেবের বাংলো। তার পেছনে ইউকেলিপটাস বৃক্ষের শাখা। ওরা একে অন্যের বাহুতে ঝুঁকে আছে। ছাদ থেকে সমুদ্রের শুভ্র জলরাশি এঁকে বেঁকে আখরোট বনে গিয়ে শেষ হতে দেখা যাচ্ছে। রঙ-বেরঙের বিজলী বাতি, কখনো জ্বলছে কখনো নিভছে। নীচের হট্টগোল সমানে চলেছে। মাঝে মধ্যে পিতাজীর রাশভারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সে কেঁপে কেঁপে ওঠে। আবার দূরের বরফাবৃত পাহাড়-চূড়ার প্রতি নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে।

আজ তার মালা আসেনি। আজ তাই চাঁদও হাসেনি। মালার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে চাঁদের সাথে সে আপন মনে কথা বলে

যায়। কখনো ছাদে বসে আবার কখনো বা বিছানায় শুয়ে শুয়ে। চাঁদের প্রতি তার ভালবাসা অপরিসীম। মালার প্রতি ভালবাসাও হয়তো অতোটা নয়। মালাকে মারলে তাকে কাঁদালে আনন্দ পাওয়া যায়। মালা যখন কেঁদে রেগে বীরদর্পে চলে যায় তখন তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে। যেন সে নিজের হাতে নিজেকে খুন করেছে এমনি মনে হয়। যেন সে নিজের সাথে নিজেই অভিমান করেছে। আবার নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। যখন তার চোখ জলে ভরে যায় এবং কান্নায় কান্নায় ফোঁপানি এসে পড়ে তখন চাঁদ তার কাছে নেমে আসে। তার অশ্রু মুছে দেয়। তার ফোঁপানি থামিয়ে দেয়। তারপর তার কাছে বসে তাকে গান শোনায়। যেসব পরী বুড়ো পীর-পাঞ্জালের বরফাবৃত পাহাড়-চূড়ায় অবস্থান করে সেসব পরীদের গান শোনায়। মালাও চাঁদকে ভালবাসে এবং চাঁদনী রাতে তারকার ঘুঙুর পরা পায়ে ফুল-ফসলে ভরে থাকা ক্ষেতে নাচতে থাকে। ধান ও গমের চারা গাছগুলোকে নিজের কুমারী বুক থেকে দুধ খাওয়ায়।

আজ এখনো চাঁদ ওঠেনি।

হয়তো চাঁদ আজ উঠবে না, এমনও হতে পারে। আজ যদি চাঁদ পীর-পাঞ্জালের বরফাবৃত চূড়ায় কানামাছি খেলতে থাকে তবে আমি কার সাথে কথা বলব? কার সাথে বলব যে, সব মানুষ আমাদের ঘরে এসেছে কিন্তু মালা আসেনি। এতো আঁধার রাতে তাদের ঘরে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চাঁদের অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে সে ছাদের উপরই ঘুমিয়ে পড়ে। রাতের কোলাহল কখন থেমে গেছে সে বলতে পারে না। কখন চাঁদ উঠেছে তাও জানে না, ছাদের উপর থেকে কে তাকে নীচে নিয়ে এসেছে কিছুই তার মনে নেই। সকালে উঠে দেখে গানের বদলে ব্যাণ্ড বাজছে, ঘর থেকে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী রান্নার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। এ গন্ধের সাথে শুধু রাজপ্রাসাদের গন্ধেরই তুলনা চলে।

মা তাকে স্নান করায়। সে তখনো মালার কথা জিজ্ঞেস করে, মালা কেন আসেনি?

মা হেসে জবাব দেন, তুমি ঘোড়ায় চড়ে তাদের বাড়ি যাবে, তারপর সে আসবে।

বর সেজে?

হাঁ।

কিন্তু আমাদের ঘরেতো ঘোড়া নেই ?
সরকারী ঘোড়া আসবে।
রাজা সাহেবের শিবির থেকে ?
হাঁ।
আব্বার জন্য যে সাদা ঘোড়া আসে সেটা ?
হ্যাঁ ?
পিতাজী প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যান ?
রাজা সাহেবের কাছে।
তিনিও বর সেজে যান ?

এ সব কথা শুনে মা শুধু হাসেন। কোন জবাব দেন না। পরে নিজে থেকেই বলেন, আজ তুমি মালার ঘরে যেও না।

কেন ?

সে লজ্জা পাবে। মা খুবই সোহাগভরা কণ্ঠে বলেন, তার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে, এজন্য তোমার যাওয়া ভাল দেখায় না।

কেন ভাল দেখাবে না ?
এখন তুমি সেয়ানা হয়ে গেছ।
এক রাতেই ?

বিয়ের পরই ছেলেরা সেয়ানা হয়ে যায়। যে মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয় তার সাথে মেশে না।

পিতাজীর গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে। আজ তিনিও হলদে রঙের ধুতি এবং নতুন রেশমী কামিজ পরেছেন।

মা তাড়াতাড়ি তাঁকে স্নান করালেন, নতুন জামা-কাপড় পরালেন। জরির আচকান পরিয়ে রেশমী রুমাল মাথায় বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, এবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখো।

মা তাঁর মাথায় চুমু খান।

আয়নায় মুখ দেখে সে হেসে উঠল। ভাবল, মালাও কি নতুন পোশাক পরেছে ? হয়ত তার মাও তাকে স্নান করিয়েছে, জরির শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে এবং মাথায় চুমোয় ভরে দিয়েছে। প্রভাত মাকে জিজ্ঞেস করল মালাও কি আজ আয়নায় মুখ দেখবে ?

হাঁ।
আয়নায় মুখ দেখে সে হেসে ফেলবে।
কেন ?

সে মায়ের প্রশ্নের জবাব দেয় না। আয়নায় নিজেকে দেখে হাসতে থাকে।

আবার বাবার ভরাট কণ্ঠ শোনা যায়। সব কিছুই ভুলে যায় সে। মা তাকে একখানা নকশী করা চাদরের উপর বসতে দেয়। তারপর এক পাশে মা এক পাশে পিতাজী ও মাঝখানে সে দুরু দুরু বুকে বসে থাকে। পণ্ডিতজী মাথা দুলিয়ে শ্লোক পাঠ করছেন, ব্যাণ্ড বাজছে, মেয়েরা গান গাইছে। দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকা যন্ত্রে বাদ্যের সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মেয়ে-পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আগত অতিথিদের সাথে কৌতুক করছে। সবাই নিজ নিজ মাথা উঁচু করে রেখেছে। পণ্ডিতজী শ্লোক বাক্য পাঠ করতে করতে মাথা উঁচুতে সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পর শ্লোক পাঠ বন্ধ রেখে পণ্ডিতজী জোরে জোরে কাশতে থাকে।

প্রভাত উঠলে দেখা গেল তার হাতের আঙুলে মূল্যবান একটা সোনার আংটি। আজ মালার সাথে তার বিয়ে হবে।

সারাদিন লোকজনের আসা যাওয়া আর খাওয়া দাওয়ার ধুম চলছে। মাঝে মাঝে দাদী-আম্মা দূর থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, অমুক বাড়ী থেকে কেউ আসেনি, সেখানে খাবার পাঠিয়ে দাও। অমুক বাড়ী থেকে এসেছিল কিন্তু খাবার না খেয়েই চলে গেছে, ওদের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দাও। বাইরে যারা সকাল থেকে গান গাইছে ওদেরতো কিছু খেতে দেবে। মালার ওসব সখী গায়িকাদের কণ্ঠে ক্ষুধা-কাতর অনুযোগ। ওরা বলছে মালার বিয়ে হয়ে গেছে এজন্য মালা দূরে চলে গেছে। এক সময় হারানো দিনের কথা তার মনে পড়ে যায়। মালা ও তার মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তাদের সম্পর্ক আড়াল করে রেখেছিল। চুপিসারে সে মালাদের ঘরের কাছে যেয়ে লজ্জায় মিইয়ে যেতো, কিছুটা ভয়ও পেতো, তারপর ফিরে আসতো। স্কুলের পথে যেতো মালাদের ঘরের পাশ দিয়ে, তারপর একদিন সে পথ ছেড়ে সে যেন মালাকে ভুলেই গেছে। এ এলাকার কোন বিশেষ সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানে উভয়ে মুখোমুখী হতো। অদ্ভুত ধরনের ছিল সে সম্পর্ক। সে কিছুই বুঝতে পারত না। তারপর সে চাঁদের সাথে মালার সম্পর্কে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিল। আবার এক সময় উভয়ে মিলে মিশে একাকার—এক দেহ এক প্রাণ হয়ে যেতো, মালাকে শুধু পরীদের কাহিনী শোনাতো। কিন্তু সেটা ছিল শৈশব---সে শৈশব আজ অনেক দূরে। এ সময়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে সারা পৃথিবীর সব দেবতাদের প্রতি অনুযোগ পেশ করেছে। কয়েকবার কেঁদে

উঠেছে। কয়েকবার নিজের দেহ মেপে দেখেছে। এদিকে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে পঞ্চতারার ফুলের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি।---প্রভাত রাশভারী কণ্ঠে বলল। কেউ যদি দেখা করতে আসে তবে তাকে আমার ঘরে বসিয়ে রেখো।

কে আসবে?

কেউ হয়ত এসে পড়তে পারে।

চৌধুরী রতন সিংএর সাথে দেখা করে এসো।

তার সাথে দেখা করে কি হবে!

একথা তো অন্তত বলে এসো যে আমরা সকালে চলে যাচ্ছি।

তিনি সবই জানেন। ওখান থেকে কে এসেছে তাও। মা চুপ করে রইলেন কিছু বললেন না।

প্রভাত হাত মুখ ধুয়ে কাঁধে কোট ঝুলিয়ে নিল এবং জর্নেলি সড়ক ধরে হাঁটতে সুরু করল। এ সড়ক বড় বাজারের দিকে চলে গেছে। মা যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে আছেন। কখনো পঞ্চ-তারা গাছের মূলে হাত রাখছেন আবার বাবলুর দেহের সাথে তুলনা করে মেপে দেখছেন। তাঁর বৃদ্ধ চোখের সামনে জনমানবহীন রাস্তার ম্রিয়মাণ ছবিরও কোন আবেদন নেই।

চাঁদ পীর-পাঞ্জালের বরফাবৃত চূড়ায় মাথা ঝুঁকিয়ে পরীদের গান শোনাচ্ছে।

দুই

চাঁদের আলোতে অট্টালিকাগুলির ধ্বংসাবশেষ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। প্রভাত মনে মনে ভাবল, প্রথমে এখানে খেত-খামার থেকে থাকবে। তারপর অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। এখন সেসব ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। আবার খেত-খামারে পরিণত হবে। সেসব ক্ষেতে তরি-তরকারি উৎপন্ন হবে। কূপ তৈরী হবে, কলকল রবে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। লোকজন ভুলে যাবে যে, এখানে এমন ধরনের ইমারত, অট্টালিকাও ছিল যেখানে তাদের নারীরা অর্ধোলঙ্গ হয়ে আলোর সন্ধান করতো, নগ্নপ্রায় হয়ে নৃত্য করতো, তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হতো। তাদের রক্ত ও ঘামে উপার্জিত টাকায় স্মৃতি-প্রদীপ জ্বালানো হতো। এসব অট্টালিকার বহু কাহিনী প্রভাতের স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো, তার মধ্যে দেখা গেল তাদের পরিবারের অনেক চেনামুখ। সে নিজেও অনেকটা সক্রিয় ছিল। মালার মুখও দেখা গেল। কানামাছি খেলার ছুটোছুটি ওর ছবিও মনে পড়ে গেল। কিন্তু সে আজ সেসব বিধৃত কাহিনীর পাতা ওল্টাতে চাচ্ছিল না। আজ সে শুধু নিজের সম্পর্কে নিজের পরিবেশ সম্পর্কে, যে পরিবেশে সে প্রতিপালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে ভাবতে চাইল। আজ সে ওদের কথাও ভাবতে চাইল, যাদের হাতে সে বড় হয়েছে কিন্তু আজ তাদের চেনার স্বীকৃতি দিতে নারাজ। এটা হয়ত তার অপারগতা।

কাঁচা রাস্তা পার হয়ে সে শহরের বড় বাজারে প্রবেশ করলো। শহর যে নামে মাত্র, আসলে একটি অনাকর্ষণীয় বাজার। দৃষ্টিকটু গলি, অনুজ্জ্বল আলো, নিরানন্দ সাদামাটা চেহারা। জায়গীরদারী ব্যবস্থা আজ অতীত দিনের স্মৃতি, কিন্তু তাদের শেষচিহ্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মতোই এখনো বিদ্যমান। চাঁদের আলোতে সে-গুলোকে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। তাদের নিদর্শন ক্ষতচিহ্নের মতই প্রতিভাত। নিশীথের ঘুমন্ত মুখমণ্ডলে চাঁদের আলোর প্রতিফলিত

রূপে সে সব ক্ষতচিহ্নকে লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

যেতে যেতে মালার ঘরের কাছে গিয়ে সে থামল। পুরনো ধাচের একটা অট্টালিকার মত বাড়ী। তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো নেই। বাইরে থেকে তাজা আলো-বাতাস ভেতরে প্রবেশ করছে। এ অট্টালিকার মত বাড়ীতে আরাম-আয়েশের যাবতীয় সামগ্রী রাজপ্রাসাদের মতোই বিদ্যমান। কারণ চৌধুরী রতন সিংএর দাদা এ ক্ষুদে জমিদারীর দেওয়ান ছিলেন। এজন্য তাঁর ঘরে রাজ-প্রাসাদ উপযোগী সব কিছুই ছিল। রাজার জীবদ্দশায় মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। রাজা চলে গেলে পর্দার বালাই আর রইল না। যারা যুগের ডাকে সাড়া দিল তারা টিকে রইল, যারা তা পারল না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চৌধুরী রতন সিং যুগের দাবি মেনে নিতে পেরেছিলেন এজন্য তিনি টিকে রইলেন। প্রভাতের পিতা-মাতা অতীতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। ফলে জীবন গঠনের জন্য প্রভাতকে অপরিচিত পরিবেশে আত্মদাহ করতে হলো।

মালার সাথে আমি কি দেখা করব। অট্টালিকার উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলোর কাছে প্রভাত যেন প্রশ্ন করল। কাল আমি চলে যাচ্ছি। কে জানে আর ফিরে আসতে পারব কি পারব না। একবার কি মালাকে দেখে যাব ?

অট্টালিকার দেয়ালগুলো বংশগত উত্তরাধিকার জড়িয়ে আছে। প্রভাত নিজের অজ্ঞাতেই পাশের ঘরের দরজার কড়া নাড়াল।

তুমি ? দরজায় দাঁড়ানো ইতরা ভীত চকিত কণ্ঠে বলল।

কেন, আমাকে দেখে ভয় পেলে নাকি ?

তোমাকে দেখে ভয় পাইনি তবে তোমার চেহারা দেখে অবশ্যই ভয় পেয়েছি।

প্রভাত হাসলো, বলল তুমি অমন সেজেগুজে যাচ্ছ কোথায় ? তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে।

অনেক ? ইতরা অবাক হওয়ার ভান করে প্রভাতের হাত ধরে বলল ভেতরে এসো। সেজেগুজে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

কেন ?

কারণ তুমি সকালে চলে যাচ্ছ।

তুমি কি করে জানলে ?

মালা বলল তুমি নাকি কদিন থেকেই উধাও।

প্রভাত চুপ করে রইল।

ইতরা ও প্রভাত একই কলেজে পড়ালেখা করেছে। একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল।

ইতরা বড়লোক পিতার মেয়ে। অনেক চোখের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু এখন একাকিনী। একমাত্র মা—যিনি নিজের ভাগ্য সম্পর্কে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের অন্ধ মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অবস্থার বীভৎসতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে একটা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপে এতদঞ্চলে সে ছিল প্রথম সাহসী মেয়ে। না হলে মেয়েদের লেখাপড়া তো বিয়ের একটা যোগ্যতা ছাড়া কিছু নয়। আত্মীয়স্বজন ইতরাকে অনেক গালমন্দ দিয়েছে, তাদের বংশের নামে কলংক আরোপ করেছে, অনেক অপকথা শুনিয়েছে কিন্তু তার দৃঢ়তার কমতি হয়নি। সবাই একবাক্যে বলেছে, দেখা যাবে এবার কি করে ঘর-সংসার সাজাবে। কে তোমাকে বিয়ে করবে। তুমি কি করে নিজের ঘর-সংসার সাজাবে ?

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। ইতরা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দিল। এমন ঘর আমি সাজাতে চাইনা যে ঘর অন্যের নির্ভরতায় টিকে থাকে।

মানুষ তোমার নামে কতো কথা রটিয়ে বেড়ায় তাতে তোমার দুঃখ হয় না ?

আমি মানুষের কথায় পরোয়া করি না বরং ওদের আমি মানুষ বলেই গণ্য করি না। যদি আমার অসংখ্য সহায়ক থাকতো তবু আমি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতাম। মানুষের অপবাদ ও মন্দ কথায় আমার দুঃখ হলে আমি আজ যা আছি তা থাকতে পারতাম না অন্য কিছু হয়ে যেতাম। এ জীবনে দুঃখ আসবে এটা আজকের কথা অথচ এ আজ খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যায়।

ইতরা ধীরে ধীরে প্রভাতের কথার জবাব দিল। সে মানুষের কথার অপবাদের হাসিমুখে জবাব দেয়। এ ব্যাপারে সে নির্ভয় নিঃশংক। কিন্তু প্রভাতের সাথে কথা বলতে গিয়ে সে স্বাভাবিক

হতে পারে না। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, ভয়ে মিইয়ে যায়। প্রভাত এটা জেনে শুনে ওকে প্রায়ই উত্যক্ত করে।

ইতরা কে তা জান ?

না। ইতরা লাজনম্র কণ্ঠে জবাব দেয়।

ইতরা অভিমন্যুর স্ত্রী। সমসাময়িককালের সবচেয়ে সুন্দরী নারী। পূর্ণ দৃষ্টিতে সে কখনো কারো প্রতি তাকিয়ে দেখেনি। প্রকৃতির সৃষ্ট কোন বস্তুও নয়।

কেন ? ইতরার কণ্ঠে বিস্ময়।

ভয়, না জানি পৃথিবীর গতি থেমে যায়।

এতো সুন্দর তার চোখ ?

হাঁ।

কিন্তু আমার তো শুধু নামটাই ইতরা।

প্রভাত আবেগ মেশানো কণ্ঠে জবাব দেয়, না, তুমি সেই ইতরা, সেই চেহারা মহাভারতে যার আকৃতি বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন কাহিনীর মধ্য থেকে ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে আছে যে চোখ সে চোখ তোমারই। তোমার মধ্যে আছে সেই পবিত্রতা যা সব দাগ ধুয়ে মুছে দেয়। তুমি সেই কাহিনীর ইতরা। যে কাহিনী আমি দাদী-মায়ের কাছে শুনেছি, চাঁদের কাছে শুনেছি। তুমি সেই পরীদের মেয়ে যে পরীরা পীর-পাঞ্জালের বরফাবৃত চূড়ায় চাঁদের সাথে কানা-মাছি খেলে বেড়ায়।

প্রভাত ইতরা সম্পর্কে কয়েকবারই ভেবেছে। ইতরা তার খেলার সাথীও ছিল না, শৈশবের স্মৃতিও নয় বরং সে তার জীবনে এসেছে যৌবনে পদার্পণের পর। যখন প্রভাত যৌবনের সঙ্গে পরিচিতি অনুভব করেছিল, চিনতে পারছিল। ইতরাকে দেখে ইতরার মোটা ভ্রূর কাজল কালো চোখের প্রতি তাকিয়ে তার মনে হতো সে চোখ নিজের যৌবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে। কখনো কখনো মনে হতো ইতরাকে আপন না করেও সে তাকে আপন করেছে। তারপর পরস্পরকে আপন করে নিয়েছে। পরস্পর পরস্পরের জীবনের আশ্রয়-স্থল। ইতরা তাকে কয়েকবার বলেছে, জীবন থেকে পালিয়ে যাও। এ সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে চলে যাও। পৃথিবী অনেক বিস্তৃত, আর মানুষের অন্তঃকরণ সংকীর্ণ হলেও অনেক প্রসারিত।

সেখানে গিয়ে কি করব ? প্রভাত প্রশ্ন করে।

সেখানে গিয়ে একটা বিরাট পৃথিবী গড়ে তোল। সেই পৃথিবী যে পৃথিবী সম্পর্কে তুমি আজ ভাবনা করছ। এ যাবত তোমায় চিন্তার জগত বিরান হয়ে আছে।

কিন্তু আজ ইতরা উদাসীন। আজ তার মোটা ভ্রূর মনোহারিণী চোখে দৃষ্টির প্রখরতা নেই, ছলকানো টলটলে নীল নীলাভ সেই ঝিলও আজ নীরব। সে চোখের ভাষায় যেন আবেদন নেই, জীবনের কোন চমক নেই। যৌবনের সুন্দরতম পোশাক পরে সে আজ প্রভাতকে নীরব বিদায় জানাতে যাচ্ছিল। এই নীরব প্রেম এক অদ্ভুত প্রেম। উভয়ের মধ্যেই এ প্রেম মুকুলিত। দুর্ঘটনার মতো যে প্রেম জন্ম নেয়। মানুষ যে প্রেমের সময়ে আত্মসম্বরণ করতে পারে না, আত্মসম্বরণ করেও সে সম্পর্কে চিন্তা করে না, আঁচড়ের চিহ্ন থেকে যায় এবং ক্ষতযন্ত্রণা পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। আজ ক্ষত-যন্ত্রণা মিলিয়ে গেছে, উভয়ে সে আঁচড় মুছে দেয়ার চেষ্টা করছে। ইতরার মা তক্তপোষে বসে রাম নাম জপ করছে। প্রভাত জিজ্ঞেস করল মালার সাথে দেখা হয়েছে ?

হাঁ আজ এসেছিল।

কি বলেছিল ?

নীরবে বসে সে কাঁদছিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপচাপ।

তুমি কি কখনো কারো জন্য কেঁদেছ ? প্রভাত অদ্ভুত দৃষ্টিতে ইতরাকে তাকিয়ে দেখল। ইতরার চোখ কাঁদতে গিয়েও যেন হেসে উঠল।

আমি তো সবার জন্যই কাঁদি। আবার হাসিও সবার জন্য। অনেক দিন আগে শেষ বারের মত নিজের জন্য কেঁদেছিলাম। তারপর হাসিখুশী দিয়ে জীবনের সাথে মোকাবিলা করেছি। আজ যখন এ শাড়ীটা পরছিলাম তখন অকারণেই আমার দুচোখ বারবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল।

কার জন্য ?

এবার হাসিময় দুচোখ কেঁদে ফেলল। ইতরা বলল, নিজের জন্য, তারপর তোমার জন্য। কেন যেন আমার হাসি পেল। মনীষীরা বলে গেছেন, হাসি-কান্নার মিলিত নামই জীবন, সে জীবন আমার ভাগ্যে পড়েছে।

প্রভাত চোখ বন্ধ করে ফেলল।

মালার সাথে দেখা করবে ?

ইতরা চাপা স্বরে জানতে চাইল।

প্রভাত কতকটা আত্মগতভাবে জবাব দিল। তোমার অনুগ্রহের নীচে আগেই চাপা পড়ে গেছি। তুমি না থাকলে কবেই যে দমবন্ধ হয়ে মরে যেতাম। তোমার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেসবকে আমি মনে মনে পূজা করি।

মালার সাথে দেখা করবে ?

ইতরা আগের মতোই জিজ্ঞেস করল।

অনেক দিন হলো দেখেছি, দেখতে তো চাই কিন্তু----ইতরা কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, তুমি বসো আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি।

তার ঘরের লোকরা কি আমার আসার ব্যাপারে টের পেয়েছে ?

নিজে থেকেই তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। ইতরা চলে গেল।

এ ছোট কামরায় প্রভাত তার জীবনের বর্ণগন্ধহীন কটি বছর কাটিয়েছে। এক মা ছিলেন যিনি তাকে জানতেন। এক চাঁদ ছিল যে তাকে চিনতো। এক ইতরা ছিল যে তাকে ভালবাসতো, এক মালা ছিল যার কাছে ছিল তার সব কিছু। আর এই ছোট কামরা তার অশ্রু দেখেছে, হৃদস্পন্দন শুনেছে, এ কামরা ছিল তার এক ভাষাহীন সাথী। কিন্তু আজ সে কামরাও তার জন্য অপরিচিত হয়ে গেছে। সামনের খোলা পথে পাহাড়ের যেসব সতেজ চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল সেগুলোকে অনেকটা উদাস মনে হচ্ছিল। ইতরার বৃদ্ধা মা রাম নাম জপ করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

প্রভাত দুচোখে উছলে ওঠা অশ্রু এক নিমেষে রোধ করল। মালা এলো। তার কাছেই বসলো। যেন তার কাছে চুপিসারে চাঁদ নেমে এসেছে।

উভয়ে পরস্পরকে দেখে। শৈশব অনেক পেছনে পড়ে আছে। দৃষ্টি আপনা আপনি ঝুঁকে পড়েছে। শৈশব দুচোখ থেকে হারিয়ে গেছে। এমনিতেই দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে প্রভাতকে দেখলো এবং তার সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবলো। কিছুক্ষণ পূর্বেও সে ছিল উদাসীন, ঘুমে আচ্ছন্ন। তার ঘুম জড়ানো চোখে ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের অশ্রু। কিন্তু প্রভাত আর মালাকে

দেখে তার উদাস ভাব কেটে গেল। সুপ্ত হৃদস্পন্দন আকস্মিকভাবে জেগে উঠলো। অদেখা আনন্দে দু'চোখ থির থির করে কাঁপতে লাগলো। প্রভাত ইতরাকে তাকিয়ে দেখল। হাসতে চেষ্টা করল। হেসে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে ইতরা চলে গেছে।

প্রভাত কথা শুরু করল।---আমার ম. চাইলেন, তিনি কিনা চাইলেন—।

মালা চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো. কি চাইলেন তিনি ?

প্রভাত খানিকটা আত্মগতভাবে বলল, আজ কতোদিন পর আমরা পরস্পরের কাছাকাছি বসেছি। মনে হয় যেন অন্য কোন জগতে আমরা উভয়ের সান্নিধ্য উভয়ে পেয়েছি।

মা কি চাইলেন ? মালা আবার জিজ্ঞেস করল।

প্রভাত বলল. মা চাইলেন তাই আমি যেন তোমার সাথে দেখা করে আসি। জানতেন যে দেখা করা যাবে না তবু বললেন। অথচ একদিন তিনি নিজেই নিষেধ করেছিলেন। আজ আবার নিজেই বললেন। অদ্ভুত ব্যাপার।

প্রভাত মালার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। বলল, এ দেয়ালগুলো কবে তৈরী হবে ?

মালা কোন কথা বলল না। প্রভাতের হাতে নিজের হাত দেখে সে খানিকটা কেঁপে উঠল।

তুমি কি চাইতে না ?

আমি তো অনেক কিছুই চেয়েছি। অনেক কিছু চাই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার ভাগ্যে শুধু চাওয়াটাই আছে তার প্রাপ্তি নেই। তা কাল তুমি যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

কেন এখানের লোকদের তোমার ভাল লাগে না ?

আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। এখন দুটি পথই খোলা আছে। জীবিত থাকার চেষ্টা করা অথবা আত্মহত্যা করা। কিন্তু আত্ম-হত্যার মৃত্যু টেনে আনতে চাই না, বেঁচে থাকার কোন পথও দেখা যাচ্ছে না, ভাবছি এখান থেকে পালিয়ে যাব এবং-------

আর আমি ? মালা কথা শেষ হতে দিল না।

তোমার স্মরণই সাথে নিয়ে যেতে পারি। সেটা নিজের কাছে রাখব। শুধু এটাই আমার সাধ্যে কুলোবে। তোমার স্মৃতি-স্মরণ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

মালার চোখে অশ্রু উছলে উঠলো।

প্রভাত কথা অব্যাহত রেখে বলল, অনেক দিন আগের কথা। একদিন আমি তোমাকে মেরেছিলাম। কারণ তুমি আনন্দের সাথে মিছেমিছি বিয়ের অনুষ্ঠান করছিলে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মালার দিকে তাকিয়ে সে বলল, শৈশবের কথা কি সবই মিথ্যে হয়ে যায়?

মালা কোন জবাব দিল না। চিন্তিত মুখে বসে রইল।

প্রভাত একই ভাবে বলল, যৌবন তোমাকে দিয়েছে অক্ষমতা আর আমাকে দিয়েছে দারিদ্র্যের বোঝা। চেষ্টা করেও আমরা পরস্পরের ঝুলি শৈশবের আনন্দ দিয়ে পূর্ণ করতে পারব না।

মালা শুষ্ক কণ্ঠে বলল, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

রোগ অনেক পুরনো। যে আবহাওয়ার প্রয়োজন সেটা এখানে নেই। সেটা এই সীমান্তে এখনো পেঁৗছেনি।

তবু, একটা প্রতিকার তো আছে?

হাঁ আছে। প্রতীক্ষা ও প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রতীক্ষা ও প্রতিজ্ঞার দীর্ঘ পথ প্রায়ই কোন উপায় বের করতে ব্যর্থ হয়। যদি আমার ব্যাপারেও অনুরূপ আচরণ ঘটে, তাহলে?

তাহলে আবার কি? মালা ভীত কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

প্রভাত কথা শেষ করে বলল, তাহলে মৃতিকে দাফন করে এক নতুন জীবনের ইমারত তৈরী করব। শৈশব জীবনের মেয়াদের মতো শৈশবের কাহিনীও হয়ে থাকে খুবই সংক্ষিপ্ত। তারপর আর কার কথা মনে রাখব?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তুমি সফল হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আজ যারা তোমাকে চিনতে পারছেনা তারা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে।

ধরো আমি সফল হলাম। ঈপ্সিত দিন এসে গেল, তখন যদি তুমি দূরে কোথাও চলে যাও?

আমি মাকে বলে দিয়েছি।

কি?

বলেছি কোন নতুন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যেন ভাল করে ভেবে দেখেন। তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। আমাদের শৈশবের

সম্পর্ক অটুট থাকতেও পারে। যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে বাধা দেব না। তবে তুমি যেখানে থাকবে, যে অবস্থায়ই থাকবে পিতাজীকে চিঠি লিখো। আমি কখনো কখনো চুপিসারে তোমাদের বাড়ী গিয়ে মায়ের সাথে দেখা করে আসব।

না, তুমি সেখানে যেও না, এতে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ছোট শহর। ভালমন্দ কথা মুহূর্তের মধ্যে ঘরে ঘরে পেঁ ৗছে যায়। ইতরা ওখানে যাওয়া আসা করবে, মায়ের কাছে যা কিছু আছে তাতে কয়েক মাস আরামে কাটানো যাবে। য. কিছু ছিল সব তাঁর কাছেই রেখে যাচ্ছি, নিজের সাথে কিছুই নেইনি।

তিনি একাই থাকবেন ?

মামা আছেন, আর ইতরা তো আছেই।

একদিন পিতাজী বলছিলেন, প্রভাত ইতরাকে বিয়ে করছে। প্রভাতের উদাস চেহারায় হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, কথাটা শুনে তোমার কি মনে হলো ?

আমার খুব খুশী লাগল।

তুমি খুশী হলে ? প্রভাতের কণ্ঠে বিস্ময়।

হাঁ। মালা আগের মতোই জবাব দিল, হাঁ খুশী হয়েছি। তুমি খুবই দুঃখে আছ হয়ত ইতরা তোমাকে আনন্দ দেবে। তুমি শান্তি লাভ করবে। কয়েক রাত ধরে ভাবলাম। এক রাতে তুমি এলে। ইতরার সাথে কথা বলতে গিয়ে তুমি প্রাণ খুলে হাসছ। আমার খুব খুশী লাগল। শুধু এজন্য যে এখন আর তুমি দূরে পালিয়ে যেতে পারবে না, ইতরা তোমাকে পালাতে দেবে না। আর আমি-----

মালা উঠে চলে গেল। তার কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সে যা বলতে চাইল তাতে জিহ্বা হৃদয়ের সহায়তা করল না। প্রভাতের কথাও শেষ হলো না। সেও কিছু বলতে পারল না।

ইতরা এলো।---কি বলছে মালা ?

প্রভাত ধীরভাবে বলল, মালার মত মেয়ে কি বলতে পারে আর আমার মত ছেলে কি জবাব দিতে পারে ? ব্যাস, দু'জনে বসে কাঁদতে শুরু করলাম।

ইতরা তার কাছে বসল। বলল, এ যাবত আমাকে সাহস দিয়ে এসেছ কিন্তু নিজের বেলায় ভীত হয়ে পড়লে ? তোমাদের উভয়ের একটা অবলম্বন দরকার। এটা সাময়িক ব্যাপার, এ অবস্থা একদিন

কেটে যাবে। কিছুটা নিজের উপর, কিছুটা মালার উপর আর সম্ভব হলে কিছুটা আমার উপর ভরসা রেখো।

প্রভাত গম্ভীর ভাবে বলল, এটা কি ধরনের জীবন, যাকে চাইলাম, যা কিছু চাইলাম সেটা কখনোই পেলাম না। এ অবস্থায় তো পাথরও ফেটে যায়।

আমিও অনেক কিছু চেয়েছি কিন্তু কি পেলাম ?

প্রভাত ইতরার চোখের দিকে তাকালো। সেখানে মূর্ত হয়ে আছে জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা---আমিও অনেক কিছু চেয়েছি কিন্তু কি পেয়েছি ?

প্রভাত ভগ্নকণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি জানি তুমি কিছু পাওনি, তুমি আমাকে ভরসা দিয়েছ কিন্তু আমি তাও দিতে পারিনি। উল্টো বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি নিরুপায়, ইতরা, দারুণ নিরুপায়। তবে মনে রেখো, মালার কাছে যদি আমার শৈশব না থাকতো, আমার কৈশোর, ছেলেবেলা না থাকতো,-------তবে আমি তোমাকে চির-দিনের জন্য আপন করে নিতাম। একদিন যখন মালার কাছ থেকে আমি আমার সব কিছু ফিরে পেয়েছি। সেসব কিছু পরে একত্রিত করে তোমার ঝুলিতে ফেলে দেব, সযত্নে গ্রহণ করো যেন---যখনই আমি হতাশ হবো তোমার কাছে আশার ভিক্ষা চাইবো। তুমি আমাকে হতাশ করবে না। চাঁদ সেজে সব সময়ে আশ্রয় দেবে।

প্রভাত ইতরার দুহাতে দুচোখে চুমু খেল। ঘুমিয়ে থাকা দৃষ্টি-হীনা জননীর পা' স্পর্শ করলো তারপর চলে গেল।

তিন

বাস-এর সফর শুরু হয়েছে। সাথে সাথে পাহাড়, পাহাড়ী নদী-নালা অপসৃত হতে শুরু করেছে। তাদের সাথেই হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব, ছেলেবেলা, স্মৃতি, কাহিনী, সেই গান, সেই সঙ্গী-সাথী—যাদের সাহচর্যে সে নিজের ধ্যান-ধারণা রূপায়িত করেছে—সবই একদিন তার সঙ্গে ছিল অথচ আজ সবই হারিয়ে যাচ্ছে, প্রতিটি মোড় চোখ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। মোড় শেষ হওয়ার পর আবার তার সাথীরা দৌড়ুতে শুরু করে।

বাসের সফর শেষ হলো।

পাহাড় পেছনে পড়ে রইল।

খোদা হাফেজ।

পাহাড়ী নদীনালা পেছনে পড়ে রইল।

খোদা হাফেজ।

তাদের সাথে সাথে শৈশব, ছেলেবেলা, স্মৃতি, কাহিনী, গান এবং ওসব সাথী যা মা হয়ে, বোন হয়ে, মালা হয়ে, ইতরা হয়ে, চাঁদ হয়ে এসেছে—খোদা হাফেজ।

একটা জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একটা ধারণা আঁধারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ট্রেনের সফর শুরু হয়েছে।

নতুন লোকদের নতুন কাফেলা বিক্ষিপ্তভাবে সুমুখে এগিয়ে চলেছে। কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, বোঝে না। শুধু এমন সব কাহিনী শোনানো হচ্ছে যেগুলোতে ব্যক্তিগত বেদনার অভিব্যক্তি, খুশীর প্রকাশ পরিলক্ষিত। নতুন সফরের নতুন সহচর। নতুন জীবনের নতুন কাহিনী। কখনো এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সব কাহিনীকে একটি মাত্র বিন্দুতে সমবেত করার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। পরিবেশ পরিবর্তিত হয়, কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে, নানা রঙে

নানা বর্ণে। কিন্তু মূল লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় না। সে ক্ষেত্রে অতীতে যা গেছে তা অতীতেই থেকে যায়, ভবিষ্যতে যা আসবে তা মেনে নেয়ার অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়।

ট্রেনের সফর শেষ হয়েছে। নতুন সাথীরা যে যার পথে পাড়ি জমিয়েছে। নতুন কাহিনীও মিলিয়ে গেছে। কাফেলা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে।

খোদা হাফেজ।

নতুন জীবন শুরু হয়েছে। নতুন ধারণা মাথা তুলেছে। মাটির গর্ভ থেকে সকালের সূর্য বেরিয়ে এসেছে। প্রভাত সূর্যকে দেখল, কেমন যেন ফিকে নিষ্প্রভ, কেমন যেন পরিবর্তিত। চাঁদও এখানে ফিকে নিষ্প্রভ আর পরিবর্তিত হয়ে হাসবে। এখানের সব কিছুই ওরকম। প্রভাতের জন্য রাস্তা সবই নতুন, এতো বড় শহর পূর্বে সে কখনো দেখেনি। যা কিছু শুনেছে এবং বইতে পড়েছে তার সাথে এ দেখার কোন মিল নেই। এতো মোটর, এত নারী, এতো ছুটোছুটি এর আগে সে কখনো দেখেনি। চারদিকে শুধু ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার মধ্যে ব্যস্তসমস্ত সংখ্যাতীত গন্তব্যবিহীন পথিক---এক আজব তামাশা। দূরে দাঁড়িয়ে সে কয়েকদিন ধরে তামাশা দেখলো। পথ খুঁজতে লাগলো। কিছুই যখন বুঝতে পারল না তখন এই ধোঁয়ার ঘূর্ণির মধ্যে হারিয়ে যাবার ছুটোছুটিতে মেতে উঠলো।

বড় স্টেশনের বাইরে ছিল একটা ছোট হোটেল। হোটেলের মালিক এক বৃদ্ধ পাহাড়ী। প্রভাত সেখানেই তার থাকার ব্যবস্থা করে নিল। সারাদিন পেটের ধান্দায় পরিশ্রম করতো আর রাত্রিকালে সময় পেয়ে সস্তা কোন কামরার খোঁজে গলিতে, এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। তার চেষ্টা ছিল যে, এতো বড় শহরে মানুষের কোন বস্তিতে যদি একটু মাথা গোঁজার জায়গা মিলে যায়। সেখানে নতুন পুরনো মানুষও ছিল অনেক। নতুন পুরনো বস্তিও ছিল অনেক কিন্তু তার জন্য কোন জায়গা ছিল না। কখনো কখনো নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারেই তার সন্দেহ দেখা দিত, মনে হতো সে যেন মানুষ নয়। অন্তত তেমন কোন মানুষ নয় যারা শহরের আলোকোজ্জ্বল বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার মধ্যে পালিত হয়ে থাকে। এ ধারণা তাকে আরো উদ্বিগ্ন করে তুলতো এবং নিজেকে সে 'নিজের মত' এক বিস্ময়কর সৃষ্টি মনে করতো। জীবনের উষ্ণতা ও শীতলতা সম্পর্কে সে অবহিত

ছিল না। স্পন্দনহীন জীবন একটি ধাক্কায় চলমান হয়ে পড়ল এবং তার গতি এতো বৃদ্ধি পেল যে, তার মাথা ঘুরতে লাগলো, মগজ ঘুলিয়ে গেল। স্বভাবতই তার সাহস কম। কোন কিছু লাভ করার জন্য নিজের সকল অনুভূতিকে একত্রিত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে জানে না। প্রাথমিক জীবনে প্রায়ই ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। এবার সে ব্যর্থতা আরো মারাত্মক রূপ নিয়েছে।

শহর ঘুরে ফিরে দেখে প্রভাত ইতরাকে চিঠি লিখলো। লিখলো যে, পাঁচ ছয় লাখ জনসংখ্যা যদি একেবারে আঠার লাখে গিয়ে পৌঁছে তবে এ শহরের অবস্থা কি হবে? ভেবে দেখ। মনে হয় যেন সারা দেশ একটা কেন্দ্রস্থলে এসে সমবেত হয়েছে। চারদিকে শুধু ক্ষুধা, আর সে ক্ষুধা নিবৃত্তির সংগ্রাম। শহরের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে কোন দোকান সাজানো হয়নি। শহরের দূরে বা কাছে এমন কোন মাঠ নেই যেখানে শিবির স্থাপিত হয়নি। শামিয়ানা ও তাঁবু টাঙানো হয়নি। আমাদের শহরে যে ব্যস্ততা ও ছুটোছুটি দেখেছি এখানে তার চেয়ে হাজারো গুণ বেশী। উচ্ছেদকৃত লোকেরা পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ চেষ্টায় তারা সব কিছু দিতে প্রস্তুত। কেউ বাড়ী খুঁজছে, কেউ চাকরি খুঁজছে, কেউ সাক্ষী, কেউ আশ্রয় খুঁজছে। কারো মেয়ে আছে তো বউ হারিয়ে গেছে; কারো স্ত্রী আছো তো মা হারিয়ে গেছে। কারো সবকিছু আছে তো দেখা গেল যুবতী বোন লাপাত্তা। যারা লুণ্ঠন করেছে তারা লুন্ঠিত দ্রব্য দুহাতে বিলাচ্ছে, যারা লুন্ঠিত হয়েছে তারা সুযোগ সন্ধান করছে। কেউ কাউকে চেনে না। কেউ কাউকে জানে না। মানুষের পদস্খলন ঘটেছে, তবে সবকিছুই যেন ঘটেছে আকস্মিক। স্রোতের মুখে কেউ যেন শ্যাওলা ভাসিয়ে দিয়েছে। আর সে শ্যাওলা চোখ মেলে চেয়ে আছে। প্রতিটি মানুষ কারো না কারো সাথে সংশ্লিষ্ট। পুরনো জীবন যার পিছনে রয়েছে, শতাব্দীর কাহিনী, সংস্কারের, শুদ্ধতার সে জীবন থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে সে জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছে। কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় তৈরী দেওয়ালগুলো মুহূর্তে ধ্বসে পড়েছে। এখন সামনে নতুন জীবনের ইঙ্গিত, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ নতুন আচরণ। সে-গুলোর সংস্পর্শে নতুন হাতে নতুন জীবন গড়ে উঠবে। এ অনুভূতির চেতনা সবার মধ্যেই রয়েছে। এ জন্য তারা নতুন উদ্যম, নতুন

যৌবন ও নতুন ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ। যারা পুরনো হাত, পুরনো উদ্দীপনা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে পড়ে আছে তারাই খুব দুঃখী, বেশী উদ্বিগ্ন, অত্যন্ত দুর্বল। যারা অতীতকে ধুয়ে মুছে নতুন সাহসে নতুন কর্মশক্তিতে ধ্যান-ধারণায় যুগের সাথে তাল মিলিয়েছে তারা সন্তুষ্ট, শান্ত এবং কিছুটা দৃঢ়। আমি আমার বিরাট স্বদেশের অনেক বড় এই শহর ঘুরে ফিরে দেখেছি, এখানে আমিই শুধু অপরিচিত নই প্রত্যেকেই অপরিচিত। প্রত্যেকে পর, প্রত্যেকে পথিক, প্রত্যেকেই অন্যের উপর সন্দিগ্ধ। পথের সন্ধান বলতে কতো ইতস্ততবোধ কতো সংকোচ, কারণ হতে পারে সে পথই নয়া জীবনের রাজপথে গিয়ে মিশেছে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছেছে।

আমি যেখানে থাকি সেটা একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল। তৃতীয় শ্রেণী এজন্যই বলছি কারণ আজকের পৃথিবীতে এর পরে আর শ্রেণী নেই। কত বড় দুর্ভাগ্য। সোদ্দা কথা, এ তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে শুধু খাবার পাওয়া যায় না। এখানে আরো অনেক হোটেল আছে সেগুলোর মধ্যে নতুন জীবন উঁকি দিতে দেখা যায়। কিন্তু সুখী জীবনের মতোই সেসব হোটেলকে দূর থেকে দেখাও আমার মত মানুষের পক্ষে মারাত্মক অপরাধের শামিল। আর অপরাধ যে রকমই হোক আমি তাকে ভয় পাই, তুমি তো জানো আমি হট্টগোল হাঙ্গামা এড়িয়ে চলি।

আমার এ তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলের মালিক একজন পাহাড়ী অধিবাসী। পাহাড়ী পরিচয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলে আমাদের শহরের স্বামীজীর কথা মনে পড়ল, স্বামীজীর মুখচ্ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠলে তোমাকে মনে পড়ল। স্বামীজীর মিষ্টি শীতল প্রসাদ-পানীয়ের কথা মনে হবার পর মিষ্টি রসভরা কি যেন আমার কণ্ঠ-নালী দিয়ে নীচে নেমে গেল। আমি মিষ্টি রসভরা দিনগুলোর স্মৃতিতে হারিয়ে গেলাম। মিষ্টিরসের স্মৃতিময় স্বপ্নে হারিয়ে গিয়ে গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি স্বপ্নভরা ঘুমের প্রত্যাশী।

হোটেলের পাহাড়ী মালিক খুবই সম্ভ্রান্ত। পাহাড়ী জেনে সে আমাকে বারোটা বাজার পর তক্তপোষে ঘুমোবার অনুমতি দিল। শহরের এ অংশ রেল স্টেশনের খুব কাছে। একারণে এখানে রাত দিনে কোন তফাত নেই। এ এলাকায় রাত্রিকালে সম্ভবত একলা

আমিই ঘুমাই। একটা রেল স্টেশনের রাত্রিতো ঘুমোবার জন্য নয় শুধু গাড়ীর প্রতীক্ষার এবং গন্তব্যে পেঁৗছার জন্যই। কে জানে চোখ লেগে এলে সেই ফাঁকে যদি গাড়ী চলে যায়, গন্তব্যে পেঁৗছানো না যায়? ভাবছি, আজব জগতে এসে পড়েছি। বারোটা বাজলে ঘুমোবার চেষ্টা করি, কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে বলতে পারি না। তবে ভোর চারটায় উঠে বসি, মিউনিসিপ্যালিটির কলে গোসল করি, তারপর নতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু এ হাঙ্গামায় আমার নতুন জীবন হারিয়ে গেছে, কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আজ পুরো বিশ দিন পর তোমাকে লিখছি। মাকে সাদামাটা ধরনের একটা চিঠি লিখেছি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি, তুমিও মায়ের বর্তমানের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে নাও। সব কিছু হারিয়ে আবার পাওয়া যায় কিন্তু মা, মায়ের ভালবাসা, মায়ের সান্নিধ্য হারিয়ে আর ফিরে পাওয়া যায় না। ও বেচারী সম্ভবত হতাশ হয়ে পড়েছে। ছোটখাটো একটা ডেরা পেলে এবং স্বস্তিময় রাতের নাগাল পেলে প্রতিদিন তোমাকে চিঠি লিখব।

মালা কেমন আছে? এখানের নিষ্প্রভ চাঁদের দিকে তাকালে মালার মুখ চোখের সামনে ঝলমলিয়ে ওঠে। তাকে বলবে পরের চিঠিতে তার জন্যও কিছু থাকবে। সকাল বিকেল তো তুমি সময় পাও, ওকে কাতুকুতু দেবে, যাতে সে হেসে ফেলতে বাধ্য হয়, বেচারী হাসতে ভুলেই গেছে। সে হাসলে---প্রাণ খুলে হাসলে আমাকে লিখো কিন্তু।

আমি তোমার মাকে বলতাম, আমার জন্যও যেন তাঁর রাম নাম জপ করেন। সেটাতো ছিল ঠাট্টা, কিন্তু এখন যে আমার তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন। একজন মায়ের আশীর্বাদই পুত্রের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিতে পারে। আমার তো দু'জন মা, তাই আমি কোলে কোলেই প্রতিপালিত হয়েছি।

অন্যেরা কেমন আছে? আনন্দ কি বিলেত থেকে ফিরে এসেছে? মালার কথা কি লিখব? তার কথা মনে পড়লে আবেগ উছলে ওঠে। তার আত্মভোলা চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠলে হাত কাঁপতে থাকে, কলম চলতে চায় না। আনন্দের ফিরে আসার পর দারুণ হৈ হুল্লোড় হতে থাকবে, সে অনেক বড়লোক হয়ে আসবে। প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলে আর কিসের অভাব? সম্ভবত সে এখন অনেক

কিছু অর্জন করেছে। দেখো উত্তরা এ ভাগ্যের মূর্তিকে দেখো, যেটা সত্য ছিল সেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে আর যেটা মিথ্যা ছিল সেটা সত্য হয়ে যাচ্ছে। একদিন আনন্দ মালার সাথে বিয়ে বিয়ে খেলছিল, আমি তখন দুজনকেই খুব মেরেছিলাম, আজ সে মিছেমিছি বিয়ে সত্য হতে চলেছে, এবার আমি কাকে মারব ? নিজের অস্তিত্বই তো আজ বিস্মৃত স্ফূতির যন্ত্রণায় বিলীন। তবে এটা ঠিক যে আনন্দের ও মালার জোড়া খুব সুন্দর হবে, তাদেরকে পাশাপাশি খুবই মানাবে। চৌধুরী রতন সিং ঠিকই ভেবেছিলেন, যুগ-যমানা তা প্রত্যক্ষ করেছে, ভুল হবে কেন ?

এখানে আমি একা নই। আমার মতো অনেকেই রয়েছে। একদিন সবাই পরস্পরকে চিনতে পারবো। তখন এ পরিচয়হীনতার পর্দা উংমোচিত হবে। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার, সময় তো দ্রুত বয়ে যায়। একটা নতুন কাহিনী জন্ম নিচ্ছে, সে কাহিনীর আমরা নায়ক। সে কাহিনীর আমরা অবলম্বন। আমাদেরকে ছাড়া সেটা কিছুতেই সাফল্যের চূড়াতে পৌঁছুতে পারবে না।

রেল স্টেশনে দারুণ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। এক সংগে অনেক-গুলা ইঞ্জিনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত অনেক গাড়ী এসে-পড়েছে। সম্ভবত অনেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। সম্ভবত অনেকের মনজিলই নিকটতর হয়েছে। জানিনা শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন আমার কতোদিন থাকবে।

একান্তই উত্তরার জন্য
প্রভাতের পক্ষ থেকে

প্রদীপের আলোতে চিঠি লিখে সে আবার চিঠিটা পড়লো। রাত বারোটা বেজে গেছে কিন্তু দিনের কর্মব্যস্ততা, কলকোলাহল এখনো স্তব্ধ হয়নি। চিঠি পড়া শেষ হলে সে বালিশের তলায় রেখে দিল।

চার

সফরের পথ দীর্ঘ, অজানা এবং বিপদসংকুল হলে সাহসী যাত্রীরও মনোবল ভেঙে পড়ে।

দূর অজানা পথের ধুলো ছড়িয়ে প্রভাত ক্রমাগত চলার পর এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলো, সেটা যে ক্লান্তি ও পরাজয়ের খুব কাছাকাছি। ক্লান্তির অনুভূতি সাময়িক, একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করা যায় কিন্তু পরাজয়ের অনুভূতি চিরন্তন, এ অনুভূতির গ্লানি মানুষের শক্তিকে চিরতরে নির্জীব করে দেয়। প্রভাতের অতীত ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত, মধুর স্মৃতির আধার, কিন্তু সৌন্দর্যময় মধুর স্মৃতিতে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। সে নিষ্প্রাণ বর্তমানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অসংলগ্ন নিঃশ্বাসের অস্তায়মান হুটোপুটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যৎ দূরে অনেক দূরে, কিন্তু অদ্ভুত কাহিনীর আলো ঝলমল আভায় তাকে খুব কাছে মনে হয়। দিগন্তে মেলানো রাঙা আবির যেন পাহাড় চূড়াকে স্পর্শ করতে চাচ্ছে। পাহাড়ের উঁচু চূড়া যেন সপ্রতীক। একই ভাবে অনিঃশেষিত স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত একজন-------

নতুন পরিবেশে সেটা ছিল প্রভাতের প্রথম ইন্টারভিউ। বিরাট অফিসের কর্মচঞ্চল অঙ্গনে অসংখ্য ছেলে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য জমায়েত হয়েছে। মলিনমুখ শুকনো ঠোঁট। দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের অবস্থান। নানা দলে তারা ভাগ হয়ে আছে। সেখানে প্রভাতের কোন সাথী নেই, সমব্যথী কেউ নেই। একটা দুর্বল গাছের শাখা ধরে সে ঝুলে আছে।

একটা শিখ ছেলের দারুণ উচ্ছৃংখলতা। যেন সবাই তার পরিচিত। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মৃতপ্রায় দেহ, কি পাংশু মুখের অধিকারী প্রতিটি যুবক নিজ নিজ ডিগ্রী আগলে এক অদৃশ্য আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তাদের মধ্যে একমাত্র তাকেই

মনে হচ্ছে জীবিত। সবাইকে সে আশ্বাস দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে যেন ইন্টারভিউর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কাগজের গায়ে সে যেন শুধু ভিন্ন জীবনের স্বাদ নেয়ার জন্যই এসেছে; সবার কাছে বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করছে, দস্তাবিজ দলিল ভাল করে পাঁচ পরতাল করে দেখছে, তারপর হালকা হাসিতে আহ বলে এমনভাবে ঘাড় দুলিয়ে যাচ্ছে যেন প্রত্যাশিত সনদ ওসব কাগজের মধ্যে কোথাও নেই।

সব প্রার্থীকে নিয়ে সে এক সময় অফিসের লনে বসে পড়ে। কায়দা করে এক গোলাকার বৃত্ত তৈরী করে। প্রভাতকে একাকী দেখে দূর থেকেই সে জিজ্ঞেস করে, কী জওয়ান! তুমি ইন্টারভিউ দিতে আসনি?

প্রভাত উছলে ওঠা চোখের জল রোধ করার চেষ্টা করছিল। শিখ ছেলেটির কথায় জ্বলে উঠল। একই ভাবে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিল, এসেছিলাম তো ইন্টারভিউ দিতেই, আপনার আপত্তি থাকেতো চলে যাব।

শিখ ছেলেটি তার বিশেষ ভঙ্গিতে বলল, দারুণ সেয়ানা মনে হচ্ছে, আমার মাথায় চড়ে বসতে চাও! রাগ হজম করো, এদিকে এসে আমাদের ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে যাও। শ্বেতাঙ্গদের লঙ্গরখানায় সবাই এক রকম।

প্রভাত মুখ ফিরিয়ে নিল।

শিখ ছেলেটি তার কাছে গেল। বলল, দেখ জওয়ান, এসব আমি পছন্দ করিনে। আমার নাম হলো অমর সিং। এই সময়ের জন্য কোন কিছুই অপরিচিত নয়। কেউ পর নয়। অমর সিং-এর বন্ধুত্বও অমর, যদিও এ পৃথিবীর কোন স্থায়িত্ব নেই। তোমার চোখে জল! চেহারায় মারাত্মক পাংশুটে ভাব। তোমার পাংশুটে মুখ দেখে আমার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে, সেও তোমার মত আজীবন কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে শেষে অশ্রুর মধ্যেই ডুব দিয়েছে। তোমার মত সংখ্যাতীত মানুষকে যে পরিবেশের মুখ দেখতে হচ্ছে সে পরিবেশে কেঁদে লাভ নেই, আত্মবিশ্বাস থাকে তো সাহস করে হেসে ফেলো।

অমর সিং-এর কণ্ঠস্বরে পাহাড়ের মত সরলতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং আত্মীয়তার আমেজে ভরপুর। পরিচয়হীনতার যে পর্দা প্রতিবন্ধক ছিল সেটা ধীরে ধীরে সরে গেছে, বন্ধুত্বের দেয়াল গড়ে উঠেছে এবং

প্রভাতের কান্নাকাতর অনুভূতির পাশ দিয়ে হাসি যেন হেসে খেলে বেরিয়ে গেছে। কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে সে অমরকে মনের গভীরে ধারণ করলো। প্রভাত তাদের বৃত্তাকার জোটে শামিল হয়ে গেল।

কোথায় থাক? অমর জিজ্ঞেস করল।

নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই। প্রভাত জবাব দেয়। যেখানে রাত হয় সেখানেই কাটাই।

প্রভাতের কাঁধে হাত রাখে অমর। যতই লুকোও কিন্তু তোমার মুখের গঠন এবং চোখের কালিমা বলছে তুমি কোন পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। তোমার নীরবতা প্রমাণ দিচ্ছে যে এখনো সংসারী হও নি।

প্রভাত সলজ্জভাবে হাসল।

অমর বলেই চলল, আমি প্রায় এক হাজার ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু এখনো শিকা ছেঁড়েনি, এখনো অনাথ হয়ে আছি। সরকারের ঘরে কিসের অভাব? যদি দিতে চায় নদী বইয়ে দিতে পারে, কেন যে এক একটি কিছুর জন্য আমাদের শুকিয়ে মারছে!

কান্নার মতো মুখভঙ্গি করল অমর। সবাই একসাথে হেসে উঠলো।

বড় সাহেবের সুদর্শন, হাল্কা পাতলা সেক্রেটারী হেলেদুলে বাইরে এলেন। সবার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো, চোখ চমকে উঠলো। তার মধ্যে সবার জীবন, মৃত্যু, সবার প্রিয়তমা, সবাই একটা না একটা চেহারা মনের গভীরে লালন করছে। বৃত্তাকার যুবকদের মধ্যে হাসির ঢেউ খেলে গেলে সেক্রেটারী মিটমিট চোখে বিস্ময়ভরে চারদিকে তাকালেন। অমর চাপা স্বরে বলল, ওয়াহ্ গুরুজীর জয়, ওয়াহ্ গুরুজীর জয়। এবার কিন্তু কেউ হাসল না। ক্ষুধার্ত এবং ঔৎসুক্য ভরা দৃষ্টিতে সবাই সেক্রেটারীকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সবাই ভুলে গেল যে, তারা ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির এবং সরকারী লঙ্গরখানায় রুটি ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

সবাইকে জীবনের রঙীন স্বপ্নে বিভোর করে অমর বলল, আপনাদের একটা মজার ঘটনা শোনাচ্ছি। এতে আপনারা সতেজ অনুভূতি নিয়ে বড় সাহেবের কাছে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবেন।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সবাই অমরের দিকে তাকালো। অমর চোখ বন্ধ করে কথা চালিয়ে গেল। আমার বর্ণিত ঘটনার সাথে কোনো

মিটমিট চোখের সম্পর্ক নেই, বরং সম্পর্ক হলো একটা ইন্টার-ভিউর সাথে। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য হাজির হলাম। তখন কলেজে পড়তাম, খাসা যুবক ছিলাম। এই বলে অমর গোঁফে তা' দিল।

সামনে বসা একটা যুবক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, ইন্টার-ভিউর কথা বলো, তোমার খাসা যৌবনের কথা এখন তোলা থাক।

অমর নিজের খাসা যৌবনের কথা ছেড়ে বলল, ঘটনাটা হলো আমাদের রাজ্যের। প্রিয় ভারত ছিল পরাধীন, কিন্তু আমাদের প্রিয় রাজ্য ছিল স্বাধীন। তহশীলদারীর জন্য ইন্টারভিউ দিলাম। রাজ্যের মধ্যে মহকুমা পর্যায়ে এ পদ রাখা হতো। একবার রাজ্য-পাল একজন ডাক্তারকে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার বানিয়ে দিলেন। পরে সেই কমাণ্ডারের উপর ক্ষেপে গিয়ে তাকে এক হাসপাতালের ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ করলেন। ব্যাস, এ হিসেবে ওলট পালট করতে গিয়ে দেখা গেল অর্থ দফতরের পদস্থ একজন কর্মকর্তার পদে নিয়োজিত হলেন একজন কর্নেল। ছেলে ইন্টারভিউ দিয়ে আসলো। অন্যেরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। একজন প্রার্থী ছিল আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইন্টারভিউ দিয়ে এলে তাকে সবার সামনে জিজ্ঞেস করলাম, কি কুমার, কেমন হলো ইন্টারভিউ ?

আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সে জবাব দিল, খুব ভাল।

কি কি জিজ্ঞেস করলো ?

কোন বিশেষ কথা তো জিজ্ঞেস করেনি, এদিক সেদিকে কিছু আলাপ করেছে।

বিশ মিনিটে শুধু শুধু এদিক সেদিকের আলাপই করেছে ?

হ্যাঁ। সে দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল। কিছুদিন পূর্বে বাবাজী অসুস্থ ছিলেন, কর্নেল তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন আছেন, কোন্ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা চলছে, কবে নাগাদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন ?

আমি হাসি চেপে রেখে বললাম, এদিক সেদিককার আরো কিছুও কি জিজ্ঞেস করেছে ?

হঠাৎ সে জবাব দিল, হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে।

সেটা কি ?

জিজ্ঞেস করল জেনারেল রোমেল সম্পর্কে জান কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ জানি। একজন বড় জেনারেল, যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু তিনি তো কবেই মারা গেছেন এটা বলিসনি ?

কুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল, তিনি মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, ভাই, সে তো কবেকার কথা।

কুমার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, ও আচ্ছা, আমি তখন শিকারে গিয়েছিলাম।

কথা শেষ করে অমর জোরে হেসে উঠল। সব শ্রোতাও একত্রে সে হাসিতে যোগ দিল।

সুদর্শন হালকা পাতলা সেক্রেটারী হেলেদুলে বড় সাহেবের কামরা থেকে আবার বাইরে এলেন। কিন্তু আগের মত বিস্ময়ভরা চোখে এবার চারদিকে তাকালেন না। হাতের এক সূক্ষ্ম ইসারায় সবাইকে কাছে ডাকলেন। সবাই নিজ নিজ ডিগ্রী, সার্টিফিকেট সামলে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, শেষে কুমারের কি হয়েছিল ?

অমর টাই ঠিক করতে করতে বলল, হয়েছিল সে-ই তহশীলদার। কর্নেল সাহেব তার বাবার আত্মীয় ছিলেন কিনা!

একথা বলে অমর একাই হাসতে লাগলো। এবার তার হাসিতে কেউ যোগ দিল না। ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেলে আবার সবাই এদিক সেদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে পড়ল। হাসি আনন্দের কোন মুহূর্ত যেন তাদের জীবনে কখনো আসেনি। অমর লনে একাকী পায়চারী করতে লাগল।

প্রভাতের জন্য চাকরির চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল একটা আশ্রয়। অমরের কথা ও আচরণে সে এমন একজনের সন্ধান পেল নতুন জীবনে যাকে সে খুঁজছিল। ইন্টারভিউতে স্বাভাবিকভাবেই সে কিছু পায়নি তবে একজনের কাছাকাছি আসার সুযোগ অবশ্য পেয়েছে। সেখানেই সুধীরের সাথেও তার সাক্ষাৎ, যে সুধীরকে অমর বলে হিরো। ওরা দুজন পুরানা বন্ধু। এবার প্রভাতও তাদের সঙ্গে শামিল হলো। দুই-এর সংখ্যাকে অলক্ষুণে মনে করা হয় এজন্য প্রভাতকে পেয়ে তারা খুশী হলো। তিনজনের কারোই বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই। আগে একা একা ঘুরতো, এখন একত্রে ঘোরাফেরা করে, কখনো এক সাথে খায়, একখানে এক সাথে ঘুমায়। শহরের

ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় থাকে। একটি স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছে, খুব ভোরে সেখানে একত্রিত হয় এবং ঘাস বা বেঞ্চের উপর বসে সারা দিনের কাজের প্রোগ্রাম তৈরী করে। রীতিমত একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় অবসর সময় কোথায় এবং কিভাবে কাটানো হবে, আলাদা হলে আবার কোথায় এক সংগে মিলবে। একজন ইন্টারভিউয়ের উদ্দেশ্যে যায়, দ্বিতীয়জন দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র টাইপ করে, তৃতীয়জন বিভিন্ন অফিসে ধর্ণা দেয়। বিকেলে সারা দিনের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট একে অন্যের কাছে পেশ করে। প্রথমে ছিল শুধু চাকরির সন্ধান, এখন তারা সকলে একটা ছোটখাটো ডেরাও খুঁজে বেড়ায়।

সকালে যেখানে তারা একত্রিত হয় সে স্থানের নাম নিজেরাই রেখেছে 'স্ক্যাণ্ডেল পয়েন্ট'। সেটা শহরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। আশপাশে বড় উঁচু উঁচু অট্টালিকা, মাঝখানে একটা প্রশস্ত সবুজ পার্ক, পার্কে উঁচু অট্টালিকাসমূহের সুদর্শন সুবেশী ছেলেমেয়েরা খেলা করে। দোলনায় চড়ে, আইসক্রীম ও টফি খায়। গভীর রাতে তারা সারাদিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে গিয়ে গান গায়, বাঁশী বাজায়, একে অন্যের মাথা মালিশ করে। বিকেলের অবস্থান সময়ে তাদের মধ্যে রোমান্টিক কথাবার্তাও হয়, কারণ স্থানটি সত্যই চমৎকার। প্রত্যুষে তাদের একত্রিত হওয়ার সময়ে সেখানে কেউ থাকে না, এজন্য প্রভাতের কাছে অমর সিং-এর স্ক্যাণ্ডেল পয়েন্টের সকাল খুব-একটা ভাল লাগত না।

স্ক্যাণ্ডেল পয়েন্ট থেকে সারাদিনের যাত্রাশুরু পর্বে অমর উচ্চৈঃস্বরে হিসেব করতো---এক---দুই---তিন। হঠাৎ প্রভাত জিজ্ঞেস করল, এক দুই তিন কি লাকী নাম্বার?

কেন? প্রথমবার তার দিকে অমর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

এই প্রত্যুষেই তুমি অপয়া নাম্বার বলতে শুরু করলে! প্রতিদিন বিকেলেই তো আমাদের হতাশ হয়ে আলাদা হতে হয়।

অমর চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, আসলেই কি এগুলো অপয়া সংখ্যা?

সুধীর ভয়ার্ত স্বরে আস্তে করে বলল, কদিন থেকে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এগুলো অপয়া সংখ্যা। এগুলো গণনা করা আরো বেশী অপয়া কাজ। কাজেই সংখ্যা গণনা ছাড়াই আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব।

তুমি ঠিকই বলছ। অমর জোরে একথা বললো। কিন্তু একটুখানি হিসেব তো করতে দেবে! এক্ষণি বলব। সে প্রভাতের প্রতি তাকালো। বলল, একের সাথে দুই যোগ করলে কতো হয়?

তিন। প্রভাত জবাব দিল।

তিনের সাথে তিন যোগ করলে কত?

ছয়।

ছয়কে দুই দিয়ে ভাগ কর।

অমর খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। আমরা তিনজন,—আমি, প্রভাত ও সুধীর। এক দুই তিন। এর অঙ্ক হলো আমরা নিজেরা অপয়া। কিন্তু এটি হতেই পারে না। কারণ আমরা অপয়া হলে পরস্পরের সাথে কখনো সাক্ষাতই হতো না। এবার চলো, তবে হিসেব করে নিতে দাও।

এটা অমর সিং-এর নিজস্ব দর্শন। বিচ্ছেদের সময় সে কথা বলে। এই বিচ্ছেদ তার অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। ঘরে বাইরে সর্বত্র সে এ বিচ্ছেদের শিকার হয়েছে। আর সেই মেয়ে এখনো তার ধ্যান ধারণার রাজ্য জুড়ে আছে। সে বলেছে, শুধু তো আমাকেই দেখছ, যদি পেতে চাও ঘুঙুর এনে দাও।

কিন্তু অমর তা দিতে পারেনি। কারণ তার কাছে ঘুঙুরের মূল্য ছিল না। সে এমন কোন আঙিনাও তৈরী করতে পারেনি যেখানে তার প্রিয়তমা চাঁদনী ঘুঙুরে শব্দ তুলে চলাচল করবে। তার জীবনে সর্বদাই বিচ্ছেদ মিলনের উপর জয়ী হয়েছে। সে অবস্থা এখনো চলেছে। কিন্তু সেদিনের পর থেকে অমর এক দুই তিন-এর হিসেব করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু চলার পথে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখে নেয়। যেন মনে মনেই গুণে নিচ্ছে। পুরো তিনদিন কেটে গেল, এর মধ্যে তারা কেউই একটা ছোটখাটো কামরা বা একটা চাকরি কিছুই যোগাড় করতে পারল না।

পাঁচ

সেদিন বিকেলে তারা তাড়াতাড়ি অবসর হলো। পুরো তিন মাসের মিলিত প্রচেষ্টায়ও তারা কোন সমাধানে পৌছুতে পারল না। তিনজন মিলে যে টাকা একত্রে সঞ্চয় করেছিল তাও হোটেলের রুটি এবং বাস-ভাড়ায় খরচ হয়ে গেছে। অমরের মামা একটা ছোট শহরে ছোট একটা মোটর ওয়ার্কশপের মালিক ছিলেন। বারবার তাগিদ দেয়ার পর তিনি কিছু টাকা পাঠালেন এবং ভবিষ্যতে আর কিছু করতে না পারায় পাকাপাকি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। পেট পুরে শুকনো রুটি খেতে পাওয়া যেতো, কিন্তু থাকার জন্য সমীচীন কোন জায়গা ছিল না। বিকেলে তাড়াতাড়ি অবসর হবার পর সারাদিনের লিখিত কার্যতালিকার উপর অমর শেষবারের মত চোখ বুলালো। সে তালিকাকে সে বলতো রেডচার্ট। অমর সামরিক কায়দায় বলল, রেডচার্ট-এ এমন কোন স্থান দেখা যাচ্ছে না যা কিনা ব্যবহার করা হয়নি। প্রভাত ও সুধীর তখন নীরব। অমর তার কথা অব্যাহত রেখে বলল, রেড চার্ট-এ কি আর কোন কর্মসূচী শামিল করা যায় না?

সুধীর রুক্ষ স্বরে বলল, কি বলতে চাও?

অমর বলল, আজকের পুরো বিকেল এবং অর্ধেক রাত্রি আমরা বাসা খুঁজে বেড়াবো, তবে বাসা এমন স্থান হতে হবে সেখানে পাগড়িরও দরকার হবে না মাথারও দরকার হবে না।

মাথা বলতে তুমি কি বুঝাতে চাও? প্রভাত জিজ্ঞেস করল।

আমি বউ এর কথা বুঝাতে চাচ্ছি। অমর চটপট বলল।

সবাই সারাদিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন। সারাদিন অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়িয়েছে। ইন্টারভিউ হয় বড়জোর পাঁচ মিনিটের কিন্তু প্রতীক্ষা করতে হয় পুরো পাঁচ ঘন্টা। সুধীর নিষ্প্রভ চোখে প্রভাতের দিকে তাকালো এবং পরমুহূর্তে চোখ বন্ধ করে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে

হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। আসলেই সে ছিল নায়ক। মন-মেজাজ খুবই নাজুক। সামান্য রোদে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যায়, মুখ শুকিয়ে যায়। চেহারা ছুরতে তাকে উঁচু পরিবারের ছেলের মতো মনে হয়। নিজের সম্পর্কে কারো কাছে কিছুই বলে না। তবে, এটা সবারই জানা যে মা ছাড়া তার কেউ নেই। মাঝে মাঝে শীতল শ্বাস ফেলে শুধু বলে, যা হবার তা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকে। তার অবস্থা দেখে প্রভাত বলল, আজ খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কালকের জন্য ও কাজ রেখে দাও। আর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, রেডচার্ট শেষ হলে অন্য কোন কর্মসূচী নেয়া হবে না।

অমর চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্য কোন জায়গা হলে প্রভাতের মুখে থাপ্পড় বসিয়ে দিত। কারণ ক্লান্তি নামক কোন কিছুতে সে বিশ্বাস করে না। সঙ্গীদের নিকট থেকে এ জাতীয় কথা সে শুনতেও রাজী নয়। জনারণ্যে দাঁড়িয়ে আছে, এজন্য সে চুপ করে রইলো। দীর্ঘক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর গুণতে লাগল এক-এক, কিন্তু দুই ও তিন আর উচ্চারণ করল না। তারপর মাথা দুলিয়ে দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। প্রভাত ও সুধীরের জন্য এটা ছিল অপ্রত্যাশিত, এজন্য তারা অমরকে অনুসরণ করলো। দীর্ঘ সময় পাশাপাশি চলার পরও অমর তাদের সাথে একটি কথাও বলল না। শেষে প্রভাত বিরক্ত হয়ে বলল, এক ঘন্টা থেকে তোমার সাথে হাঁটছি অথচ তুমি একটি কথাও বলছ না, কোথায় যাচ্ছো কি ব্যাপার কিছু বলো।

অমর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমরা আজ সাহসিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছো। আমার বাসা একান্ত দরকার। টাকা কমে এসেছে হোটেলে খাওয়া যদি বন্ধ না করি তবে একদিন শুকনো রুটির মুখ দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। একটা বাসা যদি পাই তাহলে নিজেই খাবার তৈরী করব। শুধু একটা কামরা। ছাদহীন হলেও ক্ষতি নেই। আজ ইন্টারভিউএর সময়ে বড় সাহেবের চওড়াচকোর মুখের দিকেই শুধু আমি তাকিয়েছিলাম, তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য বারবার মুখ খুলছিলেন কিন্তু আমি তাতে শুধু একটা খোলা কামরার ছবিই দেখছিলাম, প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়নি। কাজেই তোমরা আমার সঙ্গে থাকো বা না থাকো, আজ সারারাত আমি কামরার

সন্ধানে ঘুরে বেড়াব। এই বলে অমর আরো জোরে হাঁটতে শুরু করলো। প্রভাত ও সুধীর মাথা নীচু করে তার সাথে চললো। অমর এখন তাদের সাথে কথা বলছিল। আশপাশের সকল বস্তি সম্পর্কে সে ছিল অবিদিত, বস্তির বাইরের এলাকাও ছিল তার নখ-দর্পণে। সময়টি স্তম্ভ মন্দিরের পাশেও সে বেকার জীবনের কালো রাত কাটিয়েছে। সে সব স্থানে তার ব্যক্তিজীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কতো রাত সে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে বহু বাড়ী, ঘর, কামরা পেছনে ফেলে অমর এগিয়েই যাচ্ছে, শুধু সেসব দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছুই বলছে না।

প্রভাত বিরক্ত হয়ে বলল, ডজন ডজন বাড়ী পেছনে ফেলে এলাম অথচ তুমি কিছু জিজ্ঞেসই করলে না।

অমর ঘাড় দুলিয়ে বলল, আমাদের যোগ্য মতো কোন বাসা পেলেতো জিজ্ঞেস করবো, যেসব বাসা বাড়ী তোমরা দেখেছো সেগুলো কি আমাদের নাগালের মধ্যে ?

টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু করেছে। সুধীর কাতর মুখে উভয়ের প্রতি তাকালো। সে চাচ্ছিল যে বৃষ্টি থেকে কোন মতে বেঁচে যাবে। কিন্তু অমর থামল না। বৃষ্টি, বর্ষণে পরিণত হতে শুরু করলে সে একদিকে মোড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। তারপর প্রায় ভিজে গিয়ে এক অফিসার গলিতে নড়বড়ে একটা ছাদের নীচে দাঁড়ালো। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তায় আলো জ্বলছে কিন্তু সেগুলোও যেন ভিজে ম্লান হয়ে গেছে। সে বাতি থেকে আলোর চাইতে পানি বেশী ঝরছে। ময়লা আবর্জনায় এ এলাকা ভরপুর, বৃষ্টির পানিতে সেসব আরো ভড়কে উঠেছে। সুধীর বারবার সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো, অনেক কষ্টে কাগজে আগুন লাগিয়ে অবশেষে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। এ প্রজ্জ্বলিত আগুন সম্ভবত কে একজন দেখে ফেলেছে। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। অমর ঘাড় বাইরে নিয়ে বলল, কেউ আমাদের ডেকেছে।

সুধীর সিগারেটে দুতিন টান দিয়ে বলল, ডেকেছে ঠিকই তবে আমাদের নয়।

সামনের দিক থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এলো, কে ওখানে ?

একটা লোকের হাতে মোমবাতি, কিন্তু অমর কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোম নিভে গেল। অস্পস্ট আলায় দেখা পথ ধরে তারা তিনজন এগিয়ে চলল। ততক্ষণে মোমবাতি আবার জ্বালানো হয়েছে। লোকটির কাছে তাদের পেঁছার পর সে বলল, আমার নাম প্রফেসর পিতাঞ্জলী। দমকা বাতাসের জন্য ততক্ষণে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রফেসর চৌকির নীচে রেখে দিয়েছে। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোয় ওরা কামরা দেখলো। একটা ছোট্ট কামরা মেহরাবের মতো পাথরের দরজা লাগানো। দরজায় পুরনো চটের পর্দা ঝুলছে। মাঝখানে একটা চৌকি। তার উপর ছড়ানো রয়েছে মৃদঙ্গ, সেতার, ঘুঙুর। মেঝেতে একটা মাদুর বিছানো। গম্বুজের মতো কামরার ছাদ। ওরা কেউ এর আগে এ রকম কামরা দেখেনি। কামরাটি যেন একটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। তারা লক্ষ্য করলো যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজার পর্দা নৌকোর পালের মতো আন্দোলিত হয়েছে। চৌকির নীচে টিমটিম করা মোমবাতি ততক্ষণে নিভে গেছে। প্রফেসর একটুখানি ঝুঁকে তাতে অগ্নি সংযোগ করতে বললেন, থাকার জন্য তোমাদের ঠিকানা দরকার তাই না ? মুখের দিকে তাকিয়েই যেন প্রফেসর ওদের মনের কথা বুঝে ফেলেছিলেন। ওরা সমস্বরে বলল, হাঁ।

বিছানার প্রতি ইঙ্গিত করে বসতে বলে প্রফেসর বললেন, আসবাবপত্র বেশী নেইতো না ?

ওরা বসতে বসতে বললো, জ্বী না।

কি কাজ করা হয় ?

অমর বলল, চাকরির খোঁজ করছি।

পড়ালেখা কতটুকু ?

আমি গ্রাজুয়েট। অমর বলল।

তুমি ? প্রফেসর প্রভাতকে জিজ্ঞেস করল।

আমিও গ্রাজুয়েট আর আমাদের সাথী সুধীর এম. এ.।

প্রফেসর হেসে বললেন, তোমরা সবাইতো উচ্চ ডিগ্রীধারী। তা বিয়ে করেছ ?

ওরা একই সাথে না-সূচক জবাব দিল। প্রফেসর চুপ করে আছেন। ওরা তক্তপোষের এদিকে ওদিকে বসে আছে। বাইরে

আগের মতোই বৃষ্টি হচ্ছে। তবে বাতাসের জোর কমে গেছে। তবুও মোমবাতি মাঝে মাঝে নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন সে কামরাকে মনে হয় ভয়াবহ পাহাড়ী গুহা। প্রফেসরের লম্বা চুলও দেখতে খুবই ভয়ানক মনে হয়। সুধীর প্রভাতের দিকে আড়-চোখে ফিরে চাইল। প্রভাত এখন ভয় কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু বলতে চাচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে কিছু বলতে পারল না। তার গলা শুকিয়ে গেছে, সে তখন চাচ্ছিল যে অমর কিছু বলুক। কিন্তু অমর প্রফেসরের মুখের দিকে একইভাবে তাকিয়ে আছে। শেষে প্রফেসর নিভে যাওয়া বিড়িতে আগুন লাগিয়ে কথা শুরু করলেন ঃ একটা কামরা আছে, কামরায় যে থাকতো তাকে কিছুক্ষণ আগে সমাধিস্থ করা হয়েছে। খুব ভালো লোক ছিলো। মরে গেল। তোমরা সে কামরায় উঠতে পারো। কামরার দরজা জানালা কিছু নেই, তবে পাথরের শক্ত ছাদ রয়েছে। চটের পর্দা ঝুলিয়ে রাতের বেলা দরজা বন্ধ করা হয়।

এটা ছিল ওদের জন্য একটা বড় রকমের সংবাদ, কিন্তু কেউ নড়াচড়া করল না। যেন কিছুই শোনেনি, এমন ভাব দেখালো। প্রফেসর কিছু বলছিলেন কিন্তু ওদের কান যেন আগেই বধির হয়ে গেছে। তিনজনই পরস্পরকে দেখলো, তারপর প্রফেসরের প্রতি এক দৃষ্টে তাকালো। নিস্তব্ধতা ভেংগে প্রভাত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় সে কামরা ?

এদিকে, একদম এই মহল্লায়।

প্রভাত অমরকে কানে কানে বলল,

তুমিও কিছু বলো। অমর এমনভাবে তাকালো যেন বলছিল যে, আমার তো বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে, কি করে বলব। সুধীর কামরার বর্ণনা শুনেই চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল।

প্রফেসর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কি ইচ্ছা ?

আমরা কামরাটি দেখতে পারি ? প্রভাত সাহস করে জিজ্ঞেস করলো।

প্রফেসর বললো কামরার কি দেখবে ? ব্যস এই কামরার মতোই একটি কামরা। এদিকে এ মহল্লায় সব কামরা একই রকম। তোমাদের মতো এবং অন্য রকম লোকও থাকে। তা কিছু পয়সা হবে ?

কতো ? অমর শুকনো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

সামান্য কিছু।

প্রভাত বললো, তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তবে কামরা একবার দেখে নিলে ভাল হতো, সকালে আসবাবপত্র নিয়ে আসতাম।

তা হবে না, তোমাদের এক্ষুণি গিয়ে উঠতে হবে, এদিকে ঘর পাওয়া যায় না। অনেক লোক কিনা তাই। কাল পুরোহিত বেঁকে বসবে।

পুরোহিত কে ? নতুন ধরনের নাম শুনে প্রভাত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

প্রফেসর বললেন, এদিকের ল্যাণ্ড লর্ড একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর লোক।

অমর বলল, কিন্তু সে যদি সকালে আমাদের বের করে দেয় তখন ?

প্রফেসর বললেন, কিছু বললে তাকে বলবে যে, আমরা প্রফেসরের লোক, তাহলে একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তবে আগে ভাগে পয়সা দিতে হবে, অর্থের কাঙ্গাল, মানুষের ভালমন্দ বাছ-বিচার নেই, টাকা ছাড়া কিছুই চেনে না।

সুধীর বলল, জিনিসপত্র কিছু তো আনতে হবে।

প্রফেসর বললেন, রাতে জেঁকে বসলে জিনিসপত্র আপনা থেকেই এসে পড়বে। তবে পুরোহিতকে কিছু পয়সা না দিলেই নয়।

রাত কাটাব কোথায় ? প্রভাত জানতে চাইল।

রাত আছেই আর কতটুকু। অর্ধেকের চেয়ে বেশী তো মরেই গেছে, বাকি রাত আমার বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দাও।

আপনি শোবেন কোথায় ?

এ দিকে তক্তপোষে পড়ে থাকব ?

প্রফেসর একটা নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে সেতারে বসে দীর্ঘ সময় সেতার বাজালেন।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে চটের পর্দা সরে গিয়ে ভেতরে পানির ছাঁট এসে পড়ছে। মোমবাতি এখন একেবারে নিবু নিবু হয়ে যায়। সেতারের তার তখন জোরে জোরে কেঁপে ওঠে, মনে হয় যেন বৃষ্টির সুরধ্বনি একই সঙ্গে কামরার ভেতর চলে এসেছে। বাইরে বৃষ্টির জল-তরঙ্গ, ভেতরে প্রফেসরের সেতারের সুর। গানের মতোই ছন্দায়িত সে সুরলহরী। মাঝে মাঝে ছন্দময়

হাসির মতো ঘুঙুর বেজে উঠছে। চোখ বন্ধ করে তারা ঘুমুনো পর্যন্ত আজ ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পেলো। ঘুমের ঘোরেও তারা ঘুঙুরের শব্দ শুনলো। আজকের ঘুম রোমান্টিক প্রান্তরের ঘুম, এতে জড়িয়ে আছে গান, সঙ্গীত, প্রিয়তমার জীবনদায়িনী স্পর্শের আনন্দ।

ছয়

একটা মৃত্যু থেকে লাভবান হয়ে তারা কামরাটি দখল করলো। শীতে থর থর করে কেঁপে কেঁপে ওখানে একজন ক্ষুধার্তের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগে পুরো ত্রিশ দিনের ঘর ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা আদায় করতে না পেরে পাগড়ির বদলে সেটা আদায় করতে হয়েছে। কামরার কথা প্রফেসর তাদের যে রকম বর্ণনা করেছিলেন, ঠিক সেরকমই তারা পেয়েছে। দরজা জানালা বলতে যা বোঝায় তা নেই, একটা ভাঙ্গা অংশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। তাতেই জীর্ণ চটের পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই চটের পর্দা শক্ত ও অটুট করার জন্য তাতে খবরের কাগজের ছবি কেটে লাগানো হয়েছে। ক্ষুধায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিটি নিঃসন্দেহে সুরসিক ছিল। দেয়ালের এখানে সেখানে সাদা চক, লাল, কালো কালি দিয়ে সে তার মনের কৌতূহলকে প্রকাশ করেছে। এতে যোগ্যতা ও কার্যাবলীর অনেকাংশে প্রতিফলন ঘটেছে। কবি যেমন নিজ জীবনের কথা ব্যক্ত করার জন্য কবিতা লেখেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখেন, চিত্রকর ছবি আঁকেন, তেমনি বিদায়ী লোকটি তার মনের ভাব, জীবনের কাহিনী দেয়ালে দেয়ালে লিখে গিয়েছে।

এক জায়গায় লাল রঙের কালিতে লিখেছে,

প্রদীপ আছে ফুল আছে বুলবুল আছে পাখীও আছে
রাতের বেলায় সবই আছে সকাল বেলায় কিছু নেই।

কাঁচা ইঁটের চুলোর কাছে একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি পড়ে আছে। তাতে সাদা চক দিয়ে লেখা হয়েছে ঃ ভবিষ্যতের মানুষ ওরা ওদের কিছু বলো না।

মদ ও গানকে বলে ওরা জীবনের সঙ্গীত।

খবরের কাগজে একটা যুবতী মেয়ের ছবির নীচে লেখা হয়েছে ঃ

তোমার মন হলো একটা ফুলদানি
এটা যদি এমনি থাকে এবং বদলাতে না পায়
আমার হৃদয় সূর্য ও চাঁদ
ফুলদানির উপর চাঁদ সূরুযের আলো যে চমকায়।

অন্যত্র লেখা হয়েছে ঃ প্রবাসী কি ? একটা প্রবাহিত নদী,

ইতস্তত না করে না থেমে
যে শুধু নিজের পথে চলে,
আর দেশী তো হলো পাহাড়
একটু টলেও না চলেও না।

আর এক জায়গায় লিখেছে,

আনুগত্য পরায়ণতায়
আমি তো খুব খুশী নই
অবাধ্যতা করে তুমি
ভালোই করেছো।

ডানদিকে কাঁচা ইটের সারির উপর লিখেছে ঃ

আত্মীয়তার সকল বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়
ওহে চিন্তা, বন্ধু আমার দীর্ঘজীবী হও।

অন্য পাশে লেখা রয়েছে ঃ

মারলো আমায় পরের ঘরে
স্বদেশ থেকে দূরে
একাকীত্বের সম্মান আমার
রেখেছেন স্রষ্টা।

চারদিকে ছেঁড়া পুরনো কাগজ, ছেঁড়া বই, সাহিত্য পত্রিকা, নোংরা অপরিষ্কার কাপড় ছড়িয়ে আছে। অমর সুধীর প্রভাত উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পড়লো, পুনরাবৃত্তি করলো, সবকিছু উলেট-পালেট দেখলো। এক কোণে একটা ছোট কাঠের সিন্দুক রয়েছে, তাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু চাউল পড়ে আছে। এক অদ্ভুত কামরায় অদ্ভুত স্বভাবের একটা লোক বিচিত্র জীবন কাটিয়েছে। এতো তাদের জীবনের চেয়েও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল ও বিস্ময়কর।

প্রভাত ধীরে ধীরে বলল, মৃত্যুবরণকারী এতো সুন্দর স্মৃতি রেখে গেছে যা দিয়ে একটা সোনালী তাজমহল তৈরী করা সম্ভব।

সুধীর বলল, চাচীরাম পেয়ারীর কামরা এর চেয়ে অধিক উজ্জ্বল।

প্রভাত বলল কোন রাম পেয়ারী ?

সুধীর বলল, ইদানীং যেখানে থাকছি।

অমর জিজ্ঞেস করল দেখতে কেমন?

প্রভাত বলল, কিন্তু এ জিনিসপত্রের কি হবে?

অমর জবাব দিল বাইরে ফেলে দেব। এই শামিয়ানার নীচে আমরা থাকবো নাকি এসব জিনিস থাকবে?

সুধীর বলল, এটাতো মৃত ব্যক্তির সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কবিস্বভাবের মানুষ ছিল, আর কি সম্পত্তি থাকবে? এখন আমরাই এগুলোর উত্তরাধিকারী। গুছিয়ে একপাশে রেখে দেই। বেচারার আত্মা শান্তি পাবে।

প্রভাত বলল, ঠিক বলেছ। এই সব জিনিস আমাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার। আমরা এগুলোর সংরক্ষণ করব।

অমর কামরার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপ করছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, আমরা এখানে পা ছড়িয়ে শুতে পারব। প্রচুর জায়গা রয়েছে, দেয়াল-ছাদতো তো বেশ মজবুত মনে হচ্ছে। সমস্যা হলো আলোর, তারতো বিশেষ প্রয়োজনও নেই, অন্তত আমার নেই। কারণ রাতের বেলায় আমি আলোর মুখ কমই দেখেছি।

তারা সবাই কামরাটা ভালভাবে দেখে নিয়ে পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোনিবেশ করলো। চটের পর্দা সামান্য বাতাসে সরে গেলেই বাইরের দুর্গন্ধ ভেতরে ঢুকছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। বাইরে রোদ উঠেছে। অথচ ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলোর প্রয়োজনে প্রভাত চটের পর্দা উঠিয়ে দিল।

একি করছ? সুধীর রুগ্ন স্বরে বলল।

প্রভাত বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে কি?

অমরও সেদিকে তাকালো। সুধীর জামার আস্তিনে মুখ ঢেকে বলল, দুর্গন্ধে আমার নাক ফেটে যাচ্ছে। সম্ভবত আশপাশে কোথাও মানুষের লাশ পচে গেছে। এখানে থাকার চেয়ে মুর্দার গর্তে থাকাও ভালো।

অমর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, নাজুক মেজাজ হীরো, লাশের গন্ধ আর ধরিত্রীর গন্ধের পার্থক্য সম্পর্কেও তোমার জ্ঞান নেই দেখছি।

এটা ধরিত্রীর সুবাস? সুধীর প্রাথমিক জীবনের রুগ্নস্বভাব মিশিয়ে অমরের কথার উপর কথা বলল।

অমর দুহাতে কোমরের দুপাশে বেঁধে বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলল, ধরিত্রীর সুবাস কি কখনো শুঁকে দেখেছ ?

সুধীর কণ্ঠে উষ্মা মিশিয়ে বলল, হ্যাঁ।

অমর বলল, কি রকম ?

সুধীর চোখ বন্ধ করে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলল, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। ইউক্যালিপ্টাসের পাতার মতো, কাঁচাদুধের গন্ধের মতো, চাঁদের আলো মেশানো বাতাসের মতো।

প্রভাত কথার মাঝখানেই বলল, অমর ধরিত্রীর সুবাসের সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কিছুটা গোবরের গন্ধ মেশানো রয়েছে।

অমর পাগড়ি খুলে একদিকে রেখে দিয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে আমাদের পূর্বপুরুষদের এক বিরাট ছাউনি ছিল।

ছাউনি ? সুধীর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল,।

হ্যাঁ। অমর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানে নিজেদের স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার রেখে এসেছেন। অমরের চমৎকার বচনভঙ্গি, দীর্ঘ কাহিনীকেও শ্রুতিমধুর করে তুলল। সবাই গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিল। বর্ণাঢ্য অতীতের জ্যোৎস্নালোকিত রাতের কাহিনী। কিন্তু শ্রোতারা শুধু বক্তার ঠোঁটই নড়তে দেখছিল, বাইরের অসহ্য দুর্গন্ধ তাদের কান বন্ধ করে দিয়েছে। এমন সময় প্রফেসর পীতাঞ্জলী প্রবেশ করে বললেন, কি, জমিয়ে নিয়েছ তো ?

ওরা হাসিমুখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

প্রফেসর বললেন, এদিকে কেউ এসেছিল।

তিনজনই একত্রে বলল, না।

প্রফেসর বললেন, আমি বাড়ীর মালিকের কথা বলছি।

প্রভাত বলল, টাট্টুতে চড়ে একটু আগে সাধু প্রকৃতির একটা লোক এসেছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ সেই। টাকা নিয়ে গেছে ?

হ্যাঁ

কতো ?

পাঁচ টাকা আট আনা। আগের ভাড়া আর পাঁচ টাকা আট আনা অগ্রিম।

আগের ভাড়া দিলে কেন? সেজন্য তো শালা পাগড়িই দিয়ে গেছে।

অমর সব কথা শোনালো। প্রফেসরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, লোকটা ছিল খুবই গরীব, তার ভাড়া দিয়ে তোমরা ভালই করেছ, তার আত্মা শান্তি পাবে। একদিন ওকে আমিই এনে-ছিলাম। তার পরিবার পরিজন ছিল, সবাই মরে গেছে, এবার সে নিজেই মরে গেল। সে বলতো, এখানে নতুন জগৎ গড়ে তুলবে, নতুন ঘর তৈরী কররে, সুন্দর সংসার সাজাবে। সারাদিন এদিক সেদিকে ঘুরতো, রাতের বেলায় বসে লিখতো, কখনো পড়তো। ভাল পড়ালেখা জানা লোক ছিল। হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে বসল, আমি ছুটোছুটি করলাম, কিন্তু সে বাঁচল না। ভাল লোক বাঁচে না, মরে যায়। মন্দ লোকরা বেঁচে থাকে, এদিকে আমি এরকমই দেখেছি। প্রফেসর দীর্ঘ সময় যাবত বিড়বিড় করলেন। কিছুক্ষণ পর এক কোণে রাখা জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগুলো নেয়নি?

সুধীর বলল, এগুলোর উপর তার কি অধিকার?

প্রফেসর বললেন, লাওয়ারিশ লোকের জিনিস-পত্রের মালিক বাড়ীর মালিকই হয়ে থাকে, এদিকে যতো দরিদ্র লাওয়ারিশ লোক মারা যায় সবার জিনিসপত্রই বাড়ীর মালিক নিয়ে নেয়। তা এখন তোমরা ভাড়া যখন আদায় করেছ এগুলোর মালিকানা তোমাদেরই।

সুধীর খুশী হয়ে বলল, আমি এসব এদিকেই রেখে দেব। এর মধ্যে অনেক কাজের জিনিস রয়েছে।

প্রফেসর বললেন, খুব ভাল করেছ। তা ও কিছু বলল? আমি বাড়ীওয়ালার কথা বলছি।

অমর জবাব দিল, জিজ্ঞেস করল যে, তোমাদের কে এনেছে? আমরা বললাম, প্রফেসর পীতাঞ্জলী।

তারপর কি বলল?

অনেক সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর টাকা নিয়ে চলে গেল।

শালা ভয় পেয়ে গেছে। ভাল পোশাক পরিহিত লোক দেখলেই প্রমাদ গোনে। গরীবদের দেখলেই ভেতরে ভেতরে খুশী হয়। ভালই হয়েছে, আমি ভেবেছি বাক-বিতণ্ডা হবে। একদম তৃতীয় শ্রেণীর লোক। কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রফেসর বললেন, কোন জিনিসের

প্রয়োজন হলে আমাদের দুদিন আগে বলবে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই বলে শূন্যে হাত নাচিয়ে প্রফেসর চলে গেলেন।

প্রভাত বলল, লোকটিকে তো ভাল বলেই মনে হয়।

অমর জবাব দিল, হাঁ, রাতের মতো ভয়াবহ দেখাচ্ছে না, তবে রাতে বেশ বয়স্ক মনে হয়েছিল, এখন তো একদম কম বয়েসি মনে হয়।

বাড়ী কোথায় হতে পারে? সুধীরের প্রশ্ন।

অমর বলল, মাদ্রাজ, গুজরাট বা বাংলাদেশের হবে, দেখতে সেই রকমই মনে হয়। তা যেতে দাও। তোমরা এখানে বসো আমি এক্ষুণি আসছি।

প্রভাত বলল, আমারও যাওয়া দরকার।

অমর বলল, আমি এলে উভয়ে যেয়ো। সুধীর একা থাকলে মরে যাবে। আর কামরা খালি রেখো না, অন্য কেউ এসে দখল করে বসবে। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো অন্তত হয়েছে। সুধীর কাগজ পত্র ঘেঁটে একটা পুরনো বই বের করে পড়তে শুরু করলো। প্রভাত পায়চারী করতে করতে শোবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলো।

সাত

চারদিক দিয়ে ঘেরা এ জায়গার নাম আস্তাবল মহল্লা। শহর-তলীতে অবস্থিত এ স্থানে আগেকার সময়ে নওয়াব ও জমিদাররা সম্ভবত ঘোড়া পালন করতো। তাছাড়া শাহী ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ছাউনী হয়ত এখানে ছিল। কি যে ছিল এটা কারো জানা নেই তবে এখনো এখানে সেখানে গোবরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। নাসিকায় সে গন্ধ তীব্রভাবে প্রবেশ করে। মন হ্রেষাধ্বনি করতে চায়। এখানের মাটি পীত বর্ণের, মাটিতে ছোট ছোট আগাছা আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে। সেসব আগাছা দেখে প্রভাতের মনে হলো ওখানে যারা থাকে ওরাও আসলে আগাছাই, নিজে থেকে জন্ম নিয়ে এরা নিজে থেকেই মরে যায়। ওদের খবর কেউ নেয় না। ওদের ভালও বাসে না, যারা ওখানে বাস করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক, বিভিন্ন কল-কারখানায় কাজ করে, আবার কেউ মিস্ত্রী কেউ চামড়া রং করে, কেউ ট্যাক্সি চালায়, মদখোর জুয়াড়ীও কিছু রয়েছে। প্রবীণরা নতুন ধরনের নানা পেশা গ্রহণ করেছে। তাদের চেহারার দিকে এবং পেশার দিকে তাকিয়ে মিল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। রাতে সবাই একত্রিত হয়। আজব ধরনের গান, গালাগালসহ বহুরকম শব্দ শোনা যায়।

এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। চারদিকে আঁধারের বুক চিরে শান্ত নিথর নীরবতা নেমে আসে।

কিছুসংখ্যক মার্জিতরুচি বাবুরাও এখানে বাস করে। তাদের ছোট একটা বস্তি রয়েছে। পরস্পরের সাথে তারা কমই কথা বলে। অপরিচিত দৃষ্টিতে একে অন্যের প্রতি তাকায়। কেমন জিজ্ঞাসু অথচ নিষ্প্রভ তাদের দৃষ্টি। তাদের কেউ বিকেলে পানির নলের কাছে বসে কাপড় কাচে, কেউ খাবার তৈরী করে, কেউ আঙ্গিনায় বসে আকাশের তারকার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তারকার দিকে তাকিয়ে তাদের বহু সময় কেটে যায়। প্রফেসর পীতাঞ্জলী ওদের

সবার নাম জানেন। প্রফেসর কথাকলির একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ, তাঁর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার মতো একটি ছাত্রও তিনি এ যাবত পাননি। কথাকলির প্রাণস্পন্দন তিনি কারো প্রাণে জাগাতে পারেননি। এ কারণে কোথাও টিকে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তিনি নিরুদ্দিষ্টের মতো এখানে পড়ে আছেন। সব সময় নিজের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকেন। তাঁর একটা মোটা পুরনো চপ্পল, সাদা একখানা ধূতি, লম্বা একটা সাদা জামা, অবলীলায় সাবান ছাড়া প্রতিদিন তিনি ধুয়ে দেন। শুকোনোর পরই সেসব তাঁর গায়ে চড়ানো থাকে। প্রত্যূষে তিনি কোথায় বেরিয়ে যান, রাতের বেলায় ঘরে ফিরেন।

আস্তাবল মহল্লার মালিক হলেন পুরোহিত বাওয়াবীরগর। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তিনি থাকেন। সাদা চামড়া, বড় বড় চোখের অধিকারী বাওয়াবীরগর দেখতে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। ভিক্ষুদের মত একটা রেশমের চাদর তিনি গায়ে জড়িয়ে গলার কাছে বেঁধে রাখেন। সে চাদরে কোন রকম দাগ পড়তে দেননা। গলায় একটা মূল্যবান হার, দুহাতের আঙুলে অনেক আংটির সমাবেশ। বড় বড় চোখ অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করে। রবারের সাদা জুতো পায়ে দেন।

অমর সিং তাঁর নাম দিয়েছে মাখন বাওয়া, এখন এ নামেই তিনি বিখ্যাত। এ নাম ছিল তাঁর জন্য খুবই মানান সই। কারণ তাঁর দেহ মাখনের মতোই নরম তুলতুলে এবং মোলায়েম মনে হতো, একটু রোদ লাগলেই ঘামতে শুরু করতো। তাঁর রেশমের চাদর সাদা, রবারের জুতোও সাদা, নিজের জন্য সাদা সিমেন্ট ও পাথর দিয়ে সমাধি তৈরী করে রেখেছেন। তবে সমাধির পাশে একটা কালো মূর্তি রয়েছে, সেটির চারদিকে কালো চট দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। মাখন বাওয়ার সমাধি ছাড়া দূর থেকে তাকালে আস্তাবল মহল্লায় সবকিছু কালো চটের তৈরী বলে মনে হয়। অন্য সাধারণ লোকদের মতো মূর্তিটিও দুপুরের রোদে শুকাতে থাকে, রোদের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাখন বাওয়া দিনের বেলায় তাঁর সমাধি মন্দিরের ভেতর আরাম করেন। ভক্ত নারীরা এ সময়ে তাঁর শিয়রে বসে ভক্তি রসের যোগান দেয়, মাখন বাওয়া তাদের সাথে নিজের বেসুরো কণ্ঠ মেলাতে চেষ্টা করেন। এমনি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সত্ত্বেও আস্তাবল মহল্লায় কখনো শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। মৃতব্যক্তিদের যথাসময়ে দাফন

ও পোড়ানো হয়। তাদের জন্য কেউ কান্নাকাটি করে না, চিৎকার করে না, কেউ চুরি করলে পকেট কাটলে বা জুয়া খেললে সেখান থেকেই হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ছেঁড়া চটের পর্দার আড়ালে একটু আলো জ্বলে আবার নিভে যায়, পুরানো পর্দার বদলে কখনো নতুন পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়। কারো যাওয়া আসার ব্যাপারে হৈচৈ পড়ে যায় না, সাড়া জাগে না। সবাই নিরিবিলি চুপচাপ হতে থাকে। এ এলাকার প্রতি অধিবাসীদের সমত্ববোধ এতো গভীর যে, কেউ কখনো এলাকার দুর্নাম রটতে দেয়নি, মহল্লায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে এমন কিছু না করা সম্পর্কে সবাই সচেতন। তবে মাঝে মাঝে কথাকলির আওয়াজে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে, শ্রোতারা সে শব্দ ও সুরের রাজ্যে হারিয়ে যায়। কথাকলির এ জনপ্রিয়তার জন্য প্রফেসরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, এখন তাঁর প্রতিটি তৎপরতাই কথাকলি হয়ে দেখা দেয়।

প্রভাত সারাদিন এলাকায় ঘুরে ফিরে দেখলো। দুর্বল শিশু ও শীর্ণ নারীদের দেখে পরিবেশের চেয়ে বেশী ঘৃণা হতো। তাদের নামগুলোও অদ্ভুত ধরনের। নাম শুনেই তাদের দরিদ্রতার কথা আঁচ করা যেতো। আস্তাবল মহল্লার মূল এলাকা ছিল মন্দির থেকে কিছু দূরে, মাখন বাওয়া থাকতো মন্দিরের কাছাকাছি। সেখানে নতুন কামরা, বৈদ্যুতিক আলো, শক্ত ইঁটের গাঁথুনি ছিল। অন্য সব এলাকায় ছিল কাঁচা ঘর। স্থানে স্থানে বৃষ্টির পানি জমে আছে, সেসব স্থানে মশা, ব্যাং, পানির কীট বাস করে এবং নিজেদের ভাষায় অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেয়। সারা মহল্লা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এ আধ মাইল এলাকায় মাখন বাওয়ারই রাজত্ব, সব কিছুই তার একচেটিয়া মালিকানা। শহরতলীর জায়গীরের মতোই বলা যায়। ছোট ছোট জায়গায় এবং কোন কোন বিশেষ বড় জায়গায় যেসব দুষ্কর্ম ঘটে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। সেখানে উৎপাদিত দ্রব্যাদি দিনের বেলায় বিক্রী হয় এবং দামও খুব বেশী নয়। মাখন বাওয়ার একটি গাভী সারাদিন মহল্লায় ঘুরে বেড়ায়। গাভী ছাড়াও তার তিনটা মহিষ ও দুটো টাট্টু ঘোড়া, এবং দশ বারোটি পোষা বিড়াল রয়েছে। বিড়ালগুলো প্রায়ই মাখন বাওয়াকে ঘিরে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্ত পুরুষ ও নারীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। গাভী, মহিষ ও ঘোড়াকে রাত্রিকালে পাকা ঘরে বেঁধে রাখা হয়, প্রত্যেক

সপ্তাহে সকাল অথবা বিকেলে মাখন বাওয়া একটা ঘোড়ায় চড়ে পুরো মহল্লা টহল দিয়ে আসে, নিজেই ভাড়া আদায় করে, মেয়েরা দৌড়ে এসে তার পায়ে সালাম জানায় এবং তার পদধূলিকে মাথার সিদুঁরে মিশিয়ে নেয়। শিশুরা হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। দুজন যুবক অনুচর ঘোড়ার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।

আট

মহল্লার সীমানা যে স্থান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে একটা রেস্তোরাঁ রয়েছে। রেস্তোরাঁর সামনের বিরাট সাইন বোর্ডে দুদিকে দুটি ডানাওয়ালা নারী ফুলের মালা হাতে পরস্পরের দিকে উড়ছে। মাঝখানে উর্দুভাষায় লেখা রয়েছে পরীস্থান রেস্টুরেণ্টু। তার নীচে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে সর্দার ধনা সিং, পিতা সর্দার দিলাওয়ার সিং, সিকলা কুটুলী, লোহারান মহল্লা, দিল পাতিয়ান। কুচা মাখন শাহ্ ঘিওয়ালা।

পরীস্থান রেস্টুরেণ্টে সকাল বেলায় চা, বিকেলে তেলে ভাজা মাছ ও শিককাবাব, এবং আস্তাবল মহল্লায় চোলাই করা দেশী মদ পাওয়া যেতো। এক কোণে পান বিড়ি, সিগারেট ও সোডাওয়ালা পানের একটি ছোট দোকান, দোকানীর নাম, রহমত পানওয়াড়ী। তার হাতে তৈরী পানের খিলি এক সময়ে নবাব ও বেগমদের অধর চুম্বন করতো, রহমত সে সময়ের কথা ভুলতে পারত না। সর্দার ধনা সিং রেস্তোরাঁয় কম বসতো, কারণ একটা ভাড়া নেয়া বৈঠকখানায় সে জুয়ার আড্ডা বসিয়েছে। রেস্তোরাঁর চেয়ে সে বৈঠকখানায় উপার্জন বেশী হতো, এজন্য রেস্তোরাঁর প্রতি খুব একটা মনোযোগ সে দিতো না।

সর্দার ধনা সিং ছিল খুবই খোশ মেজাজের মানুষ, এক সময়ে তার প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছিলো। পিতার একমাত্র পুত্র হওয়ায় পিতার জীবদ্দশায়ই তিনটে বিয়ে করেছে। কিন্তু তিন বউই শ্বশুরের জীবদ্দশায়ই পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে। তারপর ধনা সিং কিছু দিন গরীব দুঃখীর সেবা করে কাটিয়েছে, ক্ষুধার্তদের অন্ন, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দিয়েছে, কিন্তু তার ভাষায় সবই বেকার গেছে, কোন ফয়দা হয়নি। এরপর রহমত পানওয়াড়ীর সহযোগিতায় এ হোটেল দিয়েছে। হোটেল ভালভাবে চালু হবার পর অতীত জীবনের রঙীন

স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে। মনতো আগে থেকেই উন্মুখ ছিল, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়লো। এখন একত্রে তার তিনজন সেবিকা রয়েছে, তার মনোরঞ্জন ছাড়াও অর্থনৈতিক দুরবস্থায়ও তারা সহায়তা করে। আসলে 'পরীস্থান রেস্টুরেণ্ট' এর প্রোপ্রাইটার হিসাবে ধনা সিং ওদের দিয়ে টাকাই উপার্জন করছে। রেস্তোরাঁর সাথে অনেক ছোট বড় দোকান রয়েছে, দোকানের সারি শেষ হবার পর পাকা সড়ক শুরু হয়েছে। এ পাকা সড়ক ও আস্তাবল মহল্লায় কাঁচা রাস্তার মিলন স্থলে টাঙ্গার স্টেশন। সেখানে ঘোড়ার মলমূত্র স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এ জায়গায় জনসমাগম ছিল খুব কম এ জন্য এখানে এসে প্রভাতের ভাল লাগতো। টাঙ্গা স্টেশন থেকে বাস স্টেশন পর্যন্ত জায়গাটুকু ছিল খুবই আরামদায়ক ও পরিচ্ছন্ন। ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা এখানে বাস করতো। জীবনের সব ময়লা সব আবর্জনা আস্তাবল মহল্লার দিকে প্রবাহিত হতো, আর জীবনের বিশুদ্ধ নির্মল অংশ এ বস্তিতে থেকে যেতো। ওরা তিনজন বহুবার সে পথ অতিক্রম করেছে। বিকেলে একত্রিত হয়ে তারা সড়কের বাঁকে চোখ রেখে বসে থাকতো। দূরে দূর থেকে অনেক কথা ও কাহিনী ভেসে আসতো, কিন্তু সেসব পরীস্থান রেস্তোরাঁর রেডিওর আওয়াজের মাঝে হারিয়ে যেতো। রেডিওর চিৎকার কমে এলে গ্রামোফোনের আওয়াজ তীব্রতর হয়ে দেখা দিতো। চারদিকে বিরক্তিকর অট্টহাসি মুখরিত হয়ে উঠতো। মনে হতো যেন পীর পাঞ্চালের পরীরা চাঁদকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছে---অন্তত প্রভাতের মনে তাই হতো। কিন্তু পরীদের কোথাও দেখা যেতো না, তবে তাদের কাহিনী ও অট্টহাসি অবশ্যই শোনা যেতো।

একদিন সর্দার ধনা সিংকে পরীস্থান রেস্তোরাঁয় উপবিষ্ট দেখে অমর বলল, ওর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে, চেহারা-ছুরতে মনে হয় লোকটা দারুণ রসিক।

সুধীর বলল, পাকা জুয়াড়ী, কাপড় শুদ্ধ খুলে রাখবে, একটা জুয়ার বৈঠকের মালিক।

অমর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, আমরা তো আগে থেকেই উলঙ্গ, আমাদের আর বাটপাড়ের ভয় কি! কি আর খুলবে? তবে চায়ের হিসাব চলতে পারে, তোমাদের কি ধারণা?

প্রভাতের প্রস্তাব পছন্দ হলো। সে ছিল চায়ের তৃষ্ণার্ত। সকালে চা না খেয়ে বাস্ স্টপেজ পর্যন্ত যেতেও তার কষ্ট হয়। সে সঙ্গে

সঙ্গে জবাব দিল ঃ খুবই ভাল প্ল্যান, খুবই ভাল, অতীতের সব প্ল্যানের চেয়ে ভাল, আজ বিকেল থেকেই চেষ্টা করা যাক। এ ধরনের লোক খুবই বন্ধুবৎসল হয়ে থাকে।

সেদিন তারা বাজারের গলিতে ঘুরাফিরা করছিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, যখন তারা বুঝতে পারলো যে, পরীস্থান রেস্তোরাঁয় সত্যিই বিকেল নেমেছে, তখন ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করলো। এখানে সেখানে আসর জমে উঠেনি, দুতিনটা ছোকরা কাজ করছে। অমর তিন পেয়ালা চা আনিয়ে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে ছোকরা বেয়ারার সাথে আলাপ শুরু করল। সর্দার সাহেব কখন আসেন?

বেয়ারা সাথে সাথে বলল, রাতের বেলায়।

অমর বলল, কয়টার দিকে?

বেয়ারা পাশের টেবিল মুছতে মুছতে জবাব দিল, বাদশাহ মানুষ যখনই মন চায় চলে আসেন।

অমর বলল, বিকেলে আসেন না?

বেয়ারা কোন কথা বলল না, কারণ ততক্ষণে ধনা সিং এসে পড়েছে। সাদা সেলোয়ার, রেশমী লম্বা জামা, নীল রঙের পাগড়ী তেরছা করে মাথায় বাঁধা। প্রথমে সে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, তিনজন অপরিচিত লোক বসে আছে। দূর থেকে এদের প্রতি তাকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। অমর সুযোগের সন্ধানে ছিল, সর্দারকে দেখেই বলল, আসুন, আসুন চা পান করুন।

ধনা সিং হেসে তাদের পাশে এসে বসল। নিজের আনন্দে সে ছিল নিজেই মগ্ন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে বলল, ওরে যৌবন তোকে কোথায় রাখি। তারপর গোঁফে তা দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বলল, গরম গরম কিছু নিয়ে আয়।

গরম গরম কিছু এসে গেল। প্রথম সাক্ষাতেই অমর ধনা সিং-এর সাথে চমৎকার বন্ধুত্ব জমিয়ে নিল। নিজের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করার পর উপস্থিত দুরবস্থার কথা ব্যাখ্যা করলো। প্রভাত মাঝে মাঝে তাকে সমর্থন জানালো। তাদের বুদ্ধি কাজে লাগালো, ধনা সিং নিজের রঙে পুরোপুরি বিভোর হবার পর হোটেলের তিনটা বেয়ারারকে ডেকে এনে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এই তিনজন বাবু এসে যখন যা চাইবেন, দিতে দেরী করো না। পুরোপুরি আদেশ শেষ দেয়ার আগেই প্রফেসর পীতাঞ্জলী ভেতরে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ধনা সিং তাঁকে দেখে উচ্চকণ্ঠে বলল, এসা এসো প্রফেসর এসো।

প্রফেসর নিমেষে পরিবেশ আঁচ করে নিয়ে সর্দারের পাশে বসে বললো, তোমাকে যখনই দেখি তখনই মুডে দেখতে পাই।

ধনা সিং উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল, প্রফেসর তুমি ঠিকই বলেছ, মুডতো আমার চাকরানী, মৃত্যুকালে পিতা এ সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

প্রভাতের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বলল, কোন কাজ কর্মের যোগাড় হলো ?

প্রভাত বলল, এতো তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া গেলে কি আর এদিকে আসতাম ?

ধনা সিং টেবিল চাপড়ে বলল, কি ব্যাপার, প্রফেসর তোমার কথাকলির কি খবর ?

প্রফেসর তার ডান হাত শূন্যে নাচিয়ে বলল, চা পাওয়া যাবে ?

ধনা সিং বলল, চাতো পাওয়া যাবে কিন্তু বকেয়া পয়সা কবে পাওয়া যাবে ?

প্রফেসর প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, ইয়ার বকেয়া পয়সা চেয়ে তুমি চায়ের স্বাদটাই নষ্ট করে দিয়েছ। পয়সা তোমাকে পাই পাই করে হিসেব করে দেব তারপর তোমার কাছে আর চা চাবনা চাব ঐ পকেটের জিনিস। নেশার বোতল।

ধনা সিং হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। বলল, আমি পয়সা পাই আর না পাই তুমি আজ এ বোতল অবশ্যই পাবে। এই বলে রেশমী জামার লম্বা পকেট থেকে একটা বোতল বের করে বলল, এখনো অর্ধেক আছে, শুরু কর।

প্রফেসর দুহাতে বোতল জড়িয়ে ধরে শুকনো ঠোঁটে জিহ্বা বুলিয়ে বলল, আর তুমি ?

সর্দার বলল, তুমি ওদিকে বসে শুরু কর আমি আসছি।

প্রফেসর বোতল বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার আসতে হবে না, এখানে দারুণ চেঁচামেচি, আমি বরং এগুলো কুঠিতে নিয়ে গিয়ে পান করি।

কুঠির নাম শুনে অমর, সুধীর ও প্রভাত একসাথে হেসে উঠলো। প্রফেসর চলে গেছে, ধনা সিং তখনো রেস্তোরাঁয়। সুধীর বলল, আজ ভালই জমবে।

অমর বলল, কি রকম?

সুধীর টেবিল টোকা দিয়ে বলল, প্রফেসর আজ পেয়ে গেছে, খেয়ে দেয়ে সারারাত কথাকলি রচনা করবে। আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করলে তাকে ভালই দেখায়।

ধনা সিং প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, খুবই বন্ধুবৎসল লোক, আজ খেয়ে দেয়ে নাচতে শুরু করবে।

ধনা সিং তার ঠেকখানায় চলে গেছে। ততক্ষণে চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। পরীস্থান রেস্তোরাঁয়ও রাত নেমে এসেছে, অমর বড় বেয়ারাটিকে ডেকে এনে বলল, সর্দার সাহেবের আদেশ তুমি শুনেছ?

বেয়ারা বলল, জ্বী হাঁ।

অমর বলল, আজকের চা ও গরম গরমের নগদ পয়সা দিচ্ছি, কাল সকাল থেকে বাকীতে চলবে, যা হয় সব সর্দার অমর সিং এর নামে লিখে রাখবে। কিন্তু আমরা চা-নাশতা সকাল সাতটায় চাই।

বেয়ারার ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

ওরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আস্তাবল মহল্লার দিকে অগ্রসর হলো। সুধীর আজ খুবই খুশী। এর মধ্যে সে দুএকবার প্রফেসরকে কথাকলির রঙে দেখেছিল। নেশায় বুঁদ হয়ে প্রফেসর যখন সেতার বাজাতে থাকে এবং নাচতে শুরু করে তখন রাতের চেহারা থেকে আঁধারের আবরণটা যেন খসে যায়। ময়লা দুর্গন্ধ পালিয়ে যায়। চারদিকের নীরবতা ও অন্ধকারের বুকে মুগ্ধ সঙ্গীত বেজে ওঠে। মুহূর্তে সব কিছু সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু এরকম ঘটনা খুবই কম ঘটে কারণ প্রফেসর প্রায়ই ক্ষুধার্ত থাকে, গভীর রাতে ঘরে ফিরে এসেই চুপচাপ শুয়ে পড়ে।

বাইরে আঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রফেসরের কামরায় মোমবাতি জ্বলছে, সেতার, ঘুঙুর কিছুরই শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সুধীর ও অমর প্রফেসরের কাছে গিয়ে বসলো, প্রভাত মোমবাতির আলোকে উত্তরার কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলো।

নয়

প্রভাত ও সুধীর সারাদিন কামরায় বন্দী হয়ে থাকতো, পুরনো চিঠি পড়তো, সেসব চিঠির জবাব লিখতো। তাদের কাছে অন্যকে জানানোর মতো নতুন কোন কথা ছিল না। সুধীর বস্তির চারদিকে প্রায় সারাদিন ঘুরে বেড়াতো এবং নিজের নায়িকাকে খুঁজে ফিরতো। কিন্তু চাকরির মতো নায়িকাও কল্পনানিবাসী থেকে যেতো।

অমর প্রত্যুষে বেরিয়ে যেতো এবং গভীর রাতে ফিরতো। পরিবেশের সাথে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। কথায় কথায় অভিনয় করতো, সঙ্গীদের মলিন মুখ দেখে নিজের দুঃখ ক্রোধ লুকিয়ে নিজের স্বপ্নের সাথে সবাইকে একাত্ম করতে চেষ্টা করতো। মন কিছুটা ভাল থাকলে চুপ করে থাকতো, হতাশার সময়ে খিলখিল করে হাসতো, উচ্চৈঃস্বরে সিনেমার গান গাইতো। সব কাজে সে ছিল সবার আগে, ঘর ভাড়া আদায় থেকে শুরু করে অন্য সকল প্রয়োজন সে নিজেই পূরণ করতো। সুধীর ও প্রভাতকে সে আজো বুঝতে দেয়নি যে, খাবার পয়সা কোথা থেকে যোগাড় করছে। কখনো ওরা সারাদিনের পেট জোড়া ক্ষুধা নিয়ে ঘুমুতে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই দেখে অমর বগলে খাবার চাপিয়ে হাজির হয়েছে। এমনিতে ভাগ্যের উপর মরিচা দিন দিন পুরু হচ্ছিল। একদিন অমর ইন্টারভিউতে যাওয়ার পর সুধীর ও প্রভাত ঘরে শুয়ে বসে কাটালো। পিয়ন প্রত্যুষেই তিনখানা চিঠি ফেলে গেছে, ওরা অন্ধকারের মধ্যেই চিঠির গায়ে আঙুল চাপিয়ে বক্তব্য উদ্ধারের চেষ্টা করলো। প্রভাত সুধীরকে দিয়াশলাই আনতে বললো, কিন্তু সুধীর বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে বললো, কি আর লিখবে সেতো জানাই আজে, অমরকে আসতে দাও। তারপর শুয়ে শুয়ে সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে শান্তি পেতে চেষ্টা করে। তারা জানে যে অমর এলেই আপনা থেকে মোমবাতি জ্বলে উঠবে। এ সময় অমরের গানের কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগলো।

অভ্যাসমাফিক সে গান গাইতে গাইতে আসছিলো। নিথর অন্ধকারে তার গানের সুর খুবই করুণ মনে হচ্ছিলো। এ গান থেকে তার মনের অবস্থা বোঝা সম্ভব নয় কারণ পেটে ক্ষুধা নিয়েও সে হাসিমুখে কথা বলে গান গায়। পেটপুরে খাওয়ার পরও তার চোখে-মুখে খুশী উছলে ওঠে, তবে কণ্ঠস্বরে অনেক সময় মনের অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। ঘরে প্রবেশ করার সময় অমর রামু চৌকিদারকে অবশ্যই দুচার কথা শুনিয়ে দেয়, কখনো তার কাছ থেকে কিছু পয়সাও হাতড়িয়ে নেয়। রামু চৌকিদার কানে কম শোনে, চোখেও কম দেখে তবু মন্দিরে পাহারাদারের কাজ করে। মাখন বাওয়াও এটা জানতো কিন্তু কিছু বলত না। খুব অসুবিধায় পড়ে গেলে অমর রামু চৌকিদারের কাছ থেকে একথা সেকথা বলে দুচার টাকা এনে কাজ চালায়। হাতে টাকা এলেই আবার ফেরত দিয়ে আসে, রামুর কান ও চোখের জন্য তখন কিছু ঔষধও সাথে নিয়ে যায়। আজ রামু চৌকিদার মনে হয় কোথায় ঘুরতে গেছে, অমর গুন গুন করে গান গাইতে লাগলো। ঘরে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রভাত ও সুধীরের মুখের প্রতি তাকিয়ে মনের অবস্থাটা আঁচ করতে চাইলো। জিজ্ঞেস করলো কোন খবর আছে ?

প্রভাত বলল, তোমার চিঠি এসেছে।

অমর চিঠির খামের প্রতি মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে বলল, আর কোন খবর আছে ?

সুধীর বলল, ইন্টারভিউ হয়ে গেছে।

কোন আশা ভরসা আছে ?

যাদের নেবে তাদেরকে ইন্টারভিউ-এর সময়েই রেখে দিয়েছে।

অমর চুপ করে রইল।

প্রভাত ও সুধীর যত্ন সহকারে চিঠি খুলে পড়তে লাগল। দীর্ঘ সময় তারা চিঠি পড়ার কাজে ব্যয় করলো, এর মধ্যে একে অন্যের প্রতি আড়চোখে তাকালো। অমর চিঠি না খুলে চুপচাপ শুয়ে ছাদের প্রতি তাকিয়ে রইল। প্রভাত উত্তরার চিঠি পেয়েছিল। দীর্ঘ চিঠি, অনেক কথা, বক্তব্য যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী করার জন্য মাঝে মাঝে শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে। মালার বাবা মা লিখেছে যে, তারা প্রভাতের চাকরির জন্য কয়েক বছর আগে থেকে অপেক্ষা করে আছে, চাকরি হলেই মালাকে তার হাতে তুলে দেবে, কিন্তু তাদের

সে আশা পূর্ণ হচ্ছে না। মালা নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছে, বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছে। কিন্তু এখন আর সে পারছে না। চৌধুরী রতন সিং আনন্দের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। এই আনন্দের সাথে শৈশবে মালা মিছেমিছি বিয়ে বিয়ে খেলা করতো। এখন সে খেলা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। মালা আনন্দকে জীবনসঙ্গী করতে যাচ্ছে। উত্তরার চিঠিতে মালা বেদনা-নিবিড় ভাষায় তার করুণ কাহিনী ব্যক্ত করেছে, এবং জবাব চেয়েছে। সে লিখেছে, আমি কি আত্মহত্যা করব, না জ্বলে পুড়ে মরব? চিঠি পড়ে প্রভাত নিজে নিজের কাছে একটা জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিল। প্রভাত উচ্চৈঃস্বরে চিঠি পড়েছিল। তার চিঠি পড়া শেষ হবার পর সুধীর ভগ্নকণ্ঠে তার মায়ের কাহিনী শোনালো। মা লিখেছেন, ঘরভাড়া আদায় করার জন্য তাঁর কাছে একটা পয়সাও নেই, বাড়ীওয়ালা তাঁকে উত্যক্ত করছে। মা কিছু টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, এ শীতের দিনে তাঁকে যেন ঠাণ্ডায় জমে প্রাণ না দিতে হয়।---বলতে বলতে সুধীরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

অমর চুপচাপ তাকিয়ে রইল। প্রভাত মাথা নীচু করে কাঁদছে। সুধীরের চোখেও অশ্রু টলমল করছে, মোমবাতি নিভু নিভু হয়েও জ্বলছে। চটের পর্দা নড়েচড়ে নিজের অস্তিত্বের কথা জানাচ্ছে। বাইরের সব অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করছে। আর ওরা তিনজন সে অন্ধকারে নিজেদের ভাগ্য-তারকাকে খুঁজে ফিরছে। চারদিকে মৃত্যুশীতল নীরবতা ছেয়ে আছে। হঠাৎ কি মনে করে অমর ঘরের তিনকোণে তিনটা নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল, অন্য কোণে আগে থেকেই একটা জ্বলছিল। অলোর প্রাচুর্যে অন্ধকার যেন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌লো। অমর এবার গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। চারটি মোমবাতি একত্রে জ্বলছে, তবু কেউ কারো চেহারা ভালভাবে দেখছে না। অন্ধকারের বুকে সমাহিত নীরবতা ভেঙে অমর প্রভাতকে বলল, মালাকে লিখে দাও যে, আমি তোমাকে ভালবেসেছি, শৈশব থেকে এ ভালবাসা পালন করে এসেছি। আমার বুকে তোমার প্রতি ভালবাসা জীবনের শেষ স্পন্দন পর্যন্ত টিকে থাকবে। আমাদের এ ভালবাসা প্রচলিত বৈবাহিক রুসমের উর্ধ্বে। আমি ক্ষুধার্ত, আমি বেকার, আমি দরিদ্র, আমি নিরাশ্রয়, ভালবাসা আমাদের

পেট ভরতে পারে না, আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তোমার পিতা-মাতা আগে সমীচীন চিন্তা করেছিলেন, এখন যা ভাবছেন সেটাও সবদিক থেকেই জেনে নেয়ার মতো---প্রশংসনীয়। তুমি ইচ্ছে করলে আমার ভালবাসার জন্য আত্মহত্যা করতে পারো, জ্বলে-পুড়ে মরতেও পারো, কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, সে আশীর্বাণী তোমাকে সুখী করবে। বর্তমানে এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন পুঁজি নেই।

প্রভাত অমরের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বলল, অমর উত্তরাকে কি লিখব ?

অমর বলল, উত্তরাকে লিখে দাও যে মাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করো, আর তুমি তো বেঁচে থাকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছো। উত্তরাকে এটুকু লেখাই যথেষ্ট।

প্রভাত অমরের কথা অনুযায়ী চিঠি লিখতে বসে গেল। অমর তখন সুধীরকে বলল, তুমি তোমার মাকে লিখে দাও যে, সেই শেঠ বাড়ীওয়ালা তোমাকে যদি তার বাড়ীর সর্বনিকৃষ্ট একটা কামরার এক কোণেও থাকতে না দেয়, তবে কোন মন্দির বা গুরুদোয়ারায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তারপর আমার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করো। মন্দিরে ভগবানের কাছে এবং গুরুদোয়ারার সামনে কাকুতি মিনতি করো না যেন, আমার জন্য কেঁদে কেঁদে কিছু চাওয়ারও দরকার নেই। যদি পারো যখন তখন হেসে ফেলবে। কারণ আজকাল যারা ভগবানের নিষ্প্রাণ খেয়াল দেখে হাসতে থাকে তাদেরই তিনি দান করেন।

সুধীর উদাস চোখে মোমবাতির দিকে তাকিয়ে থাকে। মোমবাতি যেন কাঁদছে। অমর তার কাছে আসা চিঠি না পড়েই জ্বালিয়ে দেয়। তার চোখে মুখে যেন কান্না লেগেই আছে। প্রভাত চাপা-কণ্ঠে বলল, চিঠিটা না পড়েই জ্বালিয়ে ফেল্‌লে !

অমর ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, এজন্য জ্বালাই কারণ এ চিঠিতে মায়ের অশ্রু, প্রেমিকার আবদার থাকে না।

---এ চিঠি তবে কার ?

---এটা ঊর্মিলার প্রেমপত্র। অমর পুড়ে যাওয়া চিঠির ছাই বিছানার নীচে রাখতে রাখতে বলল, ঊর্মিলা আমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে, কবিতার ভাষায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করে। কলেজে

একত্রে পড়ার সময় থেকে আমাদের ভালবাসা চলেছে। এই প্রেম এই ভালবাসা জিনিসটা বড় সাংঘাতিক, সেই প্রথম থেকে চলে আসছে, এখানো আছে। কিছুটা পার্থক্য অবশ্য রয়েছে, বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ, আণবিক যুগ, এজন্য ভালবাসার মধ্যে কিছুটা আণবিকতা প্রবেশ করেছে এটা ঠিক, কিন্তু তবু ভালবাসার মৌলিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের মধ্যে ভালবাসা গড়ে ওঠার পর থেকে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় তা প্রতিপালিত হতে পেরেছে, এর মধ্যে আমি ভাল নম্বর পেয়ে কয়েকটা ডিগ্রীও লাভ করেছি। প্রথমে ছিল নির্জন নিষ্কলুষ প্রেম, কিন্তু এখন একটা উচ্চ ডিগ্রী আছে, একটা পেট আছে, পেটের চাহিদার জন্য রুটিরুজির ভাবনাও আছে,---এই সব রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর পর ঊর্মিলার প্রেমের চেহারা ম্লান-ফিকে হয়ে এসেছে। তার মুখের উচ্ছল হাসি যেন মিলিয়ে গেছে। আমি তখন ভাবলাম ভালবাসা উল্লিখিত সব কিছুর মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে আছে। তারপর সে সমাধি খুঁড়তে শুরু করলাম। কিন্তু সেই ঊর্মিলাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। হীরের প্রতি রানঝার প্রেম, শিরীর প্রতি ফরহাদের প্রেম, সাহেবানের প্রতি মির্জার প্রেম কোথাও দেখা যায় না। সেই পরিবেশ নেই, সেই আত্মা নেই, সেই দেহ নেই। আমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর আমি রুটি-রুজির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম, টাকার পেছনে ছুটতে শুরু করলাম। পিতা-মাতা বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় ঊর্মিলার ভালবাসা নষ্ট হতে দিলাম না। ঊর্মিলা প্রত্যেকবারই আমাকে জিজ্ঞেস করে, ভাল কোন চাকরি হয়েছে? ঊর্মিলাকে আমার ভাল লাগার কারণ হলো সে সাধারণ মেয়েদের মতো আবেগপ্রবণ নয়, ভালবাসার জন্য জীবন দিতে চায় না।

তোমাকে বিয়ে করতে চায়? প্রভাত জিজ্ঞেস করলো।

অমর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, আমাকে ভালবাসার মতো কোন গুণ আমার নেই। বললামই তো সে আবেগপ্রবণ মেয়ে নয়, আমাকে ভালভাবে জানে বুঝে, কিন্তু আমার চাকরির প্রতিই তার সত্যিকার ভালবাসা। আমার সম্মানজনক জীবনের প্রতি তার লোভ সর্বাধিক। এ কারণেই আমি তাকে ভালবাসি। যেখানে যাই তাকে একটা চিঠি লিখে দেই, যেন সেখানে যে অবস্থায় থাকি সে

সম্পর্কে তার জানা থাকে। কিন্তু একদিন এ চিঠি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যাবে, আমি নতুন কোন ঠিকানা থেকে পুরনো ঠিকানায় উর্মিলাকে চিঠি লিখব, জবাব আসবে না। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

প্রভাত ও সুধীর অমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অমর চুপ করে আছে, আজ পর্যন্ত সে নিজের কাহিনী শোনায়নি, অন্যের কাহিনী শুনেছে। নিজের কাহিনীর প্রতি তার আগ্রহও কখনো খুব একটা দেখা যায়নি। অন্যের সমস্যা‌র কথা শুনে সেই সমস্যার কথাই সে চিন্তা করেছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে গেলে গুন গুন করে গান গায়, কখনো বা ঘুমিয়ে পড়ে কখনো সর্দার ধনা সিংহের হোটেলের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু আজ সে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে। প্রভাতের মনে হলো যেন অমর নিজের কাহিনী শোনাচ্ছে না বরং তাদের সামনে এই প্রথমবার আকুলভাবে কাঁদছে, ফরিয়াদ করছে, একটুখানি হাসি ভিক্ষা চাচ্ছে। এ হাসি কেড়ে নিয়ে অন্যকে বিলিয়ে দেবে, বণ্টন করবে, অন্যকে জীবন দান করবে,---এই তার উদ্দেশ্য। অমরের এইরূপ প্রভাতের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতার জীবন চিত্রের অপর পিঠ, এতে প্রফেসর গীতাঞ্জলির কিছু কিছু আদল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনের চেয়ে ভয়াবহ এ রাতের রূপ। কামরাটিকে মনে হচ্ছে তিনটি লাশ শুয়ে থাকা একটা কবর। সেসব লাশের গলায় এক একটা পাথরের সীল, সে পাথরে কবিতার পংক্তি উৎকীর্ণ, সে কবিতায় মৃত ব্যক্তিদের দীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রভাত এই মৃত্যুশীতল নীরবতায় ভয় পেয়ে গেল, জীবনের অনুভূতি তার কাছে যেন শিথিল হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার কণ্ঠে যেন ভেসে এলো অমরের গম্ভীর কণ্ঠঃ মালাকে লিখে দাও। প্রভাত তখন দীর্ঘ চিঠি লিখতে শুরু করেছে। সুধীর মায়ের পবিত্র পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, অমর কম্বল গায়ে চুপচাপ বসে আছে।

দশ

সকালে প্রভাত সবার আগে ঘুম থেকে উঠতো, কল থেকে পানি আনতো, চা তৈরী করতো। চা খেয়ে অমর বাইরে গেলে সুধীর আবার ঘুমুতো, ততক্ষণে প্রভাত খাবার তৈরীতে লেগে যেতো। দু'বেলার খাবার তৈরীর দায়িত্ব সে নিজের উপর রেখে দিয়েছিল। সুধীর ইদানীং মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, আগে কেমন উদাস মনমরা থাকতো, পরিবেশের সাথে কিছুতেই একাত্ম হতে পারছিল না। এখন কিন্তু মানিয়ে নিয়েছে, চোখেমুখে হাসি খুশী ভাব ফুটে উঠেছে। তার এ পরিবর্তন প্রভাতের চোখ এড়ালো না, কিন্তু কিছু বলতে সাহস হলো না। একদিন সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে, কোঁকড়ানো চুল আঁচড়িয়ে বাইরে যাওয়ার সময় প্রভাত বলল, আজকাল এভাবে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

সুধীর আড়চোখে প্রভাতের প্রতি তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, প্রেম করছি।

কার সাথে ?

মাখন বাওয়ার এক ভক্ত নারীর মেয়ের সাথে। প্রভাত চুপ করে রইল। তার সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। সুধীর বলল, জেনেই যখন ফেলেছ তবে শোন, মাখন বাওয়ার সাথে বন্ধুত্ব করেছি কিছু পাওয়া যাবে, খাবার, ভাং, চরস ইত্যাদি। তার ভক্ত নারীর সেই মেয়েকে পাওয়াও বিচিত্র নয়। তার মাধ্যমে হয়তো একটা চাকরিও জোটানো যাবে। তুমিও এসো, এ রকম মেয়েদের মতো কাজ কতদিন করবে। এখানে আরো বহু মেয়ে আসে, কারো মধ্যে মালাকে খুঁজে পাও কিনা দেখো। আর পছন্দ হলেই বেধড়ক প্রেম করতে শুরু করো। বেকার বসে মাছি মারার চেয়ে প্রেম করা অনেক ভালো। ভালভাবে অবসর সময় কাটানোর চমৎকার উপায়। কি মনে হয় তোমার, ঠিক না ?

প্রভাত বলল, তোমার এ প্রেমের কথা অমর যদি জানতে পারে তাহলে তোমাকে আস্ত রাখবে না।

সুধীর সঙ্গে সঙ্গে বলল, প্রেম আমি নিজের জন্য করছি না, সবার জন্যই করছি। একটা ভাল চাকরি, ভাল থাকার জায়গা পাওয়া গেলে খুশীর আর অন্ত থাকবে না।

প্রভাত বলল, তুমি কি করে বুঝলে যে এ প্রেমে তোমার চাকরি এবং থাকার জায়গার সমস্যার সমাধান হবে?

সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, গত তিন মাসে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, মাখন বাওয়ার কাছে দু'শ্রেণীর মেয়েরা আসে। এক শ্রেণী খুব গরীব, অন্য শ্রেণী খুবই ধনী। মাঝামাঝি অবস্থার কোন মেয়ে আসে না। শকুন্তলা খুবই ভাল ঘরের মেয়ে, মাখন বাওয়া তার মায়ের গুরু। ডিগ্রীতো কোন কাজে এলো না, ভাল চেহারা কাজে এসেছে।

সুধীর হেসে ফেলে নিজের ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেল। শকুন্তলা সত্যিকার অর্থেই শকুন্তলা। দুষ্মন্ত তার শকুন্তলাকে বনহরিণীর মধ্যে ঘেরাও অবস্থায় লাভ করেছে আর আমার শকুন্তলাকে আমি মাখন বাওয়ার শিষ্যদের মধ্য থেকে লাভ করেছি। প্রতিটি যুবতী মেয়ের মনেই অদেখা একজন যুবকের ছবি অংকিত থাকে, বাস্তবে সে ছবি একজন যুবকের চেহারার সাথে মেলাতেই তারা চমকে ওঠে। শকুন্তলার অবস্থাও হয়েছে তাই, আমাকে দেখেই সে মুগ্ধ হয়েছে। মাছ খাবার গিলে ফেলেছে, রেশমী সুতো আমার শক্ত হাতে ধরা রয়েছে, ইচ্ছে করলে কাছে টানতে পারি, ইচ্ছা করলে---

সুধীরের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রভাত বলল, যাই বলো, বড়লোকের মেয়ে হলে তোমার সাথে ঝুলে পড়তো না।

সুধীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে বলল, আজকের সব কথা মিথ্যা, সব সম্পর্ক মিথ্যা, প্রেম, ভালবাসা মিথ্যা, সবই প্রতারণা। এ বনস্পতি পৃথিবীতে মিথ্যা বলেই বেঁচে থাকতে হয়। আমিও শকুন্তলার কাছে বলেছি যে, আমি বড়লোকের ছেলে, সুন্দর সুদর্শন হওয়ার সাথে সাথে আমার আভিজাত্য এতটুকু কম নয়। কিন্তু আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই, সত্যিকার অর্থে সমগ্র পরিবারের চোখের আলো হতে চাই। আমার এই মিথ্যা অভিনয়ে শকুন্তলা মোহিত হলো, আজকালকার মেয়েরা প্রথমে শুধু প্রভাবিত হয়, পরে কিছু কিছু পছন্দ

করে তারপর কামনা করে। তারপর এক সময়ে তারা অনুভব করে যে কিছু যেন হয়ে গেছে। উঠতে-বসতে, শুতে ঘুমুতে চলতে ফিরতে প্রেম গড়ে ওঠে, প্রেম প্রকাশ পায়। এই ভালবাসা করার দরকার হয় না, এমনিতেই হয়ে যায়।

সুধীর ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা দেয়ার মতো সহজভাবে তার সরস বক্তব্য রাখছিল আর প্রভাত সুবোধ ছাত্রের মতো সে বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বক্তৃতা শেষে সুধীর নিজেকে সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রভাত হেসে বলল, আমার তো ওখানের ব্যাপারে জানা নেই, কিন্তু এখানে তুমি যে অভিনয় দেখিয়েছ তাতে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি।

সুধীর চটের পর্দা উঠিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

প্রভাত চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওর সঙ্গে কি প্রতিদিন তোমার দেখা হয়?

সুধীর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বলল, হা হা প্রতিদিন; অসংকোচে। এখন পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালবাসা গড়ে উঠেছে। পরস্পরকে দেখে মনে হয় আমরা যেন যুগ যুগান্তের সাথী, প্রথম থেকেই একত্রে পথ চলা শুরু করেছি এখনো চলেছি। মাঝে কিছুকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আবার আমাদের মিলন হয়েছে।

দেখতে কেমন?

খুবই সুন্দরী, নিষ্পাপ, বোকা বোকা চেহারা। ওখানে সবাই আমার চেহারায় প্রেমে পড়ছে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা কথা---

কি সেটা?

অমরকে বলো না, ও যেন জানতে না পারে তার যা মেজাজ ক্ষেপে যাবে।

কিন্তু কতোদিন গোপন রাখবে? একদিন তো সে জেনে যাবেই।

আমি হাত জোড় করে মাখন বাওয়াকে বলেছি যে, মন্দিরের কাছে তোমার চরণে আমাদের জায়গা করে দাও। কিছুটা রাজী হয়েছে। আশা করা যায় শীগগীর পুরোপুরি রাজী হয়ে যাবে।

আমি চরস, ভাং অভ্যাস করতে শুরু করেছি। ওদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ ওখানে এছাড়া একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের লেখাপড়া জানা জীবন মাখন বাওয়ার মূর্খ শিষ্যদের জীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট।

প্রভাত যেন ক্ষেপে গেল। বলল, তুমি কি এজন্যই বাড়ী থেকে বেরিয়েছ? তোমার মা যিনি মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর কথা ভুলে গেছ?

সুধীর একইভাবে জবাব দিল যে, কারো আশ্রয় দ্বারা কিছু পাওয়া যাবে না। মাখন বাওয়ার পরিচয়ের পরিধি ব্যাপক, কাউকে বলে আমাদেরকে কাজ কাম জুটিয়ে দিতে পারবে। আমি যদি বেঁচে থাকি সবাই বেঁচে থাকবে, মাও বাঁচবেন।

সুধীর আবার চুল পরিপাটি করে, শিশ দিয়ে শকুন্তলার সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেল। বাইরের পরিবেশ উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রভাত চটের পর্দা তুলে ছায়ার দৃশ্য দেখতে লাগলো। আস্তাবল মহল্লার অতীত স্মৃতি আন্দাজে অনুমানে মনের পর্দায় তুলে ধরলো। সে ভাবলো এক সময় এখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা যেতো, বিচিত্র রুচি ও মানসিকতার মানুষ বাস করতো। তারা যেন এখনো ঘোড়ার মতো শব্দ করছে---হি হি হি। আমাদের দানা পানি দাও, ঘাস দাও, আলো দাও, রোদ দাও, হি হি হি। প্রভাতের মনে হলো, এই আকুল অভিব্যক্তির মধ্যেও বেঁচে থাকার, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার প্রতিজ্ঞা বিদ্যমান। তার মনে হলো সে যেন এই মিলিত অভিব্যক্তির সাথে একাকার হয়ে আছে।. তার ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়লো, বাইরে মাখন বাওয়ার ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেল। অমর তার কাছে ঘর ভাড়া রেখে গিয়েছিল, প্রভাত তাড়াতাড়ি সে টাকা মুঠোয় চেপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সাদা পোশাক পরিহিত মাখন বাওয়া প্রফেসর পীতাঞ্জলির কামরার সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে। তার অনুচর দু'টি তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া নোংরা পোশাক পরিহিতা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে উরু চুলকাচ্ছে আর চুলে হাত ফেরাচ্ছে। মেয়েরা নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগ্ন ছেলেমেয়েরা কিছু না বুঝেও হাত জোড় করে নিজেদের ময়লা দাঁত বের করে হাসছে। মাখন বাওয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বকবক করতে করতে প্রভাতের দিকে তাকালো। প্রভাত বিনীতভাবে এক টাকার পাঁচটা নোট ও একটা আধুলি মাখন বাওয়ার হাতে দিয়ে বলল, পুরোহিতজী প্রফেসর, মানুষ ভালই, সম্ভবত সময় পায়নি, না হলে ভাড়া পরিশোধ করে দিতো।

মাখন বাওয়া তার সাদা থলে থেকে আট দশটা এলাচি ও বাদাম বের করে একত্রে মুখে পুরে বলল, ওর কথা বলো না খোকা, শালা

বড় কামচোর হারামখোর। মাখন বাওয়ার সাদা চেহারায় চোখ দুটিকে অঙ্গারের মতো দেখাচ্ছিল। প্রভাত নম্রভাবে বলল, বেচারা সারাদিন কাজের সন্ধানে থাকে, কাজ পেয়ে গেলে পাই পয়সাসহ হিসেব করে দিয়ে দেবে।

মাখন বাওয়া বলল, আরে না না তুমি জানো না খোকা, শালা কাজ দেখে পালিয়ে যায়, শালা বড় কামচোর হারামখোর।

প্রভাত জিজ্ঞেস করল, আসলে ব্যাপার কি ?

মাখন বাওয়ার জ্বলন্ত চোখ চকচক করে উঠল। বলল, আমার দুই ভক্তের মেয়ে রামলীলার খুবই ভক্ত, ওরা নাচ শিখতে চায়। বিশ টাকা মাসিক বেতনে কথা হয়েছিল, কিন্তু সে এক মাসও কাজ করেনি ছেড়ে এসেছে, শালা বড় কামচোর হারামখোর। সে ছুকরির ধান্দায় লেগে আছে, শালা কামচোর।

ছুকরির নাম শুনে প্রভাতের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। সে সংযত কণ্ঠে বলল, কোন্ ছুকরি পুরোহিতজী ?

পুরোহিতজী প্রভাতের কথার কোন জবাব দিল না। মুখে ফেনা বের করে ক্রুদ্ধভাবে চলে গেল। প্রভাত ভাবতে লাগলো, ছুকরির এ চক্কর চলছে কেন ? সুধীর ছুকরির ধান্দায় আছে, প্রফেসরের মতো লোকও একই ধান্দায় ঘুরছে। এটা যদি সত্য হয় তবে প্রফেসর আদতেই কামচোর। আমরা সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই, কোথাও ডালরুটির ব্যবস্থা হচ্ছে না, ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আমি ঘর থেকে বেরুনোই ছেড়ে দিয়েছি। প্রখর রোদ আর ধুলিবালিতে হেঁটে হেঁটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, অথচ আজ প্রফেসর বিশ টাকা হারে দু'টি চাকরি ছেড়ে দিল। তাও তার ঈপ্সিত ধান্দার সাথে মানানসই কাজ। সে কাজ ছেড়ে অন্য ছুকরির পেছনে ঘুরছে। স্বগোত্রীয় লোকের এ ধরনের তৎপরতায় প্রভাত কুপিত হলো। সারাদিন মনে মনে ক্রোধ হজম করলো। গভীর রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করলো কিন্তু প্রফেসর লা পাত্তা। অমর ও সুধীরের কোন খবর নেই।

হঠাৎ কে যেন চটের পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে বলল, জেগে আছ ?

তোমারই প্রতীক্ষা করছি।

তোমার জন্য কিছু ফল এনেছি। আজ কিছু পয়সা পেলাম, পেট ভরে খেলাম। তুমি অসুস্থ এজন্য কিছু ফল কিনে আনলাম।

প্রভাত দেখল প্রফেসরের চোখে-মুখে উঠেছে যৌবনের উচ্ছলতা।

প্রভাত বলল, মাখন বাওয়া এসেছিল।

প্রফেসরের মুখ লাল হয়ে গেল, বলল, কে বাড়ীর মালিক? শালা বোধ হয় ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল। শালা বিশ গজও হাঁটতে পারে না, বিনা পরিশ্রমে পয়সা রোজগার করছে। সারা মহল্লা যেন মুফ্‌তরের মাল পেয়েছে, মনে করে যেন বাবার জমিদারী। আমি বলে দিয়েছি যে, ফালতু পয়সা হাতে এলে দে'ব তার আগে নয়।

কিন্তু তুমি সেই কাজ ছেড়ে দিলে কেন?

কোন্ কাজ?

মাখন বাওয়া যে কাজ দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে প্রফেসর বললো, বুঝেছি। আরে সেই ছুকরিদের নাচ শেখাব? ওরা দাঁত বের করে হাসলে মনে হয় যেন তাড়ি খেয়ে বমি করছে। একদম বাজে---থার্ড ক্লাস। ওরা শুধু বিয়ের জন্য, ফ্যাশানের জন্য নাচ শিখতে চায়। কিছু পয়সার দরকার ছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুমাস খেটেছি। তাও আমি রাসলীলার পক্ষপাতি নই। আমি অবশ্য শিল্প বিক্রয় করি কিন্তু সেটা রুচিশীল পাত্রের কাছে; নাহলে এখানে না খেয়ে ধুকে ধুকে মরব কেন?

প্রফেসর ধপাস করে বসে পড়ল। ক্রোধে সে ফুঁস্‌ছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে চলল, শালা একেবারে বাজে কথা বলে। নিজের লাশের জন্য শীতল নিবাস তৈরী করেছে, আর আমরা চটের পর্দার আড়ালে ধুকে ধুকে মরছি। আমি জানি, সে আমাদের এ মহল্লা থেকে বের করতে চায়। কিন্তু আমরা এ এলাকা ছেড়ে যাব না। একদিন এখানে সুন্দর বস্তি গড়ে তুলব, বড় লোক হবো, সেদিন সবাই এ মহল্লার মালিক হবো। শালা প্রতি বিশ টাকায় এক টাকা কমিশন চায়, বলে এটা নাকি ধর্মীয় কাজের জন্য। এরজন্য আমি ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

প্রফেসর বোতল খুলে গ্লাসে পানীয় ফেলে ঢক ঢক করে গিলতে লাগল।

প্রভাত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সেই ছুকরি দুটি কে?

প্রফেসর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, সেই শ্রমিকের মেয়ে চান্দার কথা বলছে। আমি সব জানি। চান্দা অন্য মেয়েদের মতো তার ভক্ত হবে না, সে যক্ষ্মার রোগী, বাড়ীর মালিক শালা শিয়ালের মতো

তার কাছে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েটি যুবতী, সে মরবে না, আমি তাকে মরতে দেব না। একদিন ভাল হয়ে যাবে, তখন আমারও সুদিন আসবে, এই চটের পর্দার ঘর তখন আর থাকবে না, আমি প্রফেসর গীতাঞ্জলি সেদিন কথাকলির মাঝে টিকে থাকব। যাদের এনে বসিয়েছি তাদের ঘর তৈরী করে দেব, সেই সুদিন আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

প্রফেসর বিড় বিড় করে চলে গেল। আজ তার মাথার চুল আগোছালো, চোখেমুখের উদাসীনতা ও অস্থিরতার ছাপ মুছে গেছে, তার বদলে শান্ত সমাহিত ভাব ফুটে উঠেছে। কথায় তার নতুন দিনের স্বপ্ন, নতুনের প্রত্যাশা, অজ্ঞাতেই তার বাহু বাতাসে দোল খাচ্ছে। আজ সে প্রাণ ভরে মদ পান করেছে, সবকিছু ভুলে কথাকলির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে, স্বপ্নিল আবেশে ঘুমের শান্তির রাজ্যে জড়িয়ে গেছে ঘুঙুর মৃদঙ্গের শব্দে।

সে রাজ্য মুখরিত হয়ে আছে, চটের পর্দা মৃদুমন্দ বাতাসের নৃত্য করছে। আস্তাবল মহল্লার বাতাসে ঘোড়ার শত বছরের পুরানো ময়লার গন্ধ ছড়িয়ে আছে, চান্দা প্রচণ্ডভাবে কেশে পরিবেশের জীবন চিত্র ফুটিয়ে তুলছে। কে এই চান্দা ? প্রফেসর এ রকম মেয়ে কোথা থেকে নিয়ে এলো মাখন বাওয়া যাকে ভক্ত হিসেবে পেতে চায় ? প্রভাত ভাবতে থাকে। ততক্ষণে অমর ও সুধীর এসে পড়েছে, এসেই তারা প্রফেসরের কামরায় চলে গেল। প্রভাত, প্রফেসর ও চান্দা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এগার

চান্দা এক কৃষকের মেয়ে। হলুদাভ চেহারা, বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল, লম্বা ঘাড়। হালকা পাতলা গড়নের দেহের উপর লম্বা ঘাড় খুবই মানান সই। দিবালোকের চাঁদের মতো তার নিষ্প্রভ ম্লান মুখে নিষ্পাপত্বের ছোঁয়া। হাসলে মনে হয় যেন শুকনো ধান ক্ষেতে বাতাস নেচে যাচ্ছে। তার চোখে ফুটে উঠেছে মায়ের কোল-হারা শিশুর চাহনি, যে চাহনিতে শিশু সবাইকে তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছে। মায়ের মায়াভরা কোল, নিজের ঘরের আঙ্গিনা, বাগান খেলনার কথা জিজ্ঞেস করছে। চান্দার চোখ জিজ্ঞাসায় আকুল হয়ে এক সময়ে গম্ভীর হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তেই তাতে ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক। যেন তার কিছু মনে পড়ে যায়। হারানো দিনের স্মৃতি মনের অঙ্গনে জেগে ওঠে। যন্ত্রণাদায়ক কাশি বিরত না করা পর্যন্ত চান্দা ভাবনার রাজ্যে ডুবে থাকে।

সতের আঠার বছরের চান্দা হেসে খেলে নেচে গেয়ে তার শৈশব কাটিয়েছে। তাদের গ্রাম ছিল একটা ছোট চঞ্চল নদীর তীরে। সুফলা জমিতে ফসল ফলিয়ে লোকজন সুখে শান্তিতে দিন কাটাতো। সবারই স্বাস্থ্য ছিল ভাল, অসময়ে সেখানে কখনো বৃষ্টি হয়নি। কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। ঝগড়া কলহ হয়নি। কোন জিনিসের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে কাউকে কখনো বাইরে যেতে দেখা যায়নি। চান্দার বাবা মরে গিয়েছিল, মা বেঁচে ছিল, একটা ভাই ও ভাবী ছিল, তাদের ছিল দুটি ছেলেমেয়ে। ছোট একটি পরিবারে সকল কিছু ছিল, জীবনের হাসি আনন্দের সব উপকরণই তাদের ছিল। কিন্তু হঠাৎ একবার তাদের উপর প্রাকৃতিক অভিশাপ নেমে এলো, ছোট চঞ্চল নদী উছলে উঠলো। অল্পকালের মধ্যে দুপাশের জনবসতির অধিকাংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। গ্রামের কৃষককুল, তাদের কৃষির গরু, মাঠের

ফসল সব নিয়ে গেলো। কয়েক দিনের প্রবল বন্যায় সব ছাড়িয়ে যারা বেঁচে ছিলো তারা ছিল সর্বহারা।

চান্দার বয়স ছিল তখন চৌদ্দ বছর। বন্যা শেষে উজাড় গ্রামের প্রতি তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। মা ভাই ভাবী, তাদের ছেলেমেয়ে কেউই তখন আর বেঁচে ছিল না। চান্দার খেলাঘর, খেলনাগুলো কোথায় যে ছিল সে জায়গার হদিস সে বের করতে পারল না। সবকিছু হারিয়ে চান্দা জীবনের সন্ধানে ধাবমান একটি কাফেলার সঙ্গ নিল। নিজের গ্রাম, নিজের মাঠ আর মাটি ছেড়ে সব কৃষক শ্রমিকেরা কাজ খুঁজতে শুরু করলো। চলতে চলতে অনেক ছোট শহর ছাড়িয়ে তারা বড় শহরে এসে পড়লো, সেখানে বন্যাদুর্গতদের জন্য নতুন বস্তি তৈরী করা হচ্ছিল। অন্যদের মত এখানে চান্দাও শ্রমিকের কাজ করতো। সবারই উদ্দেশ্য ছিল যে কিছু পুঁজি সঞ্চয় করে আবার আগের জীবনে ফিরে যাবে। চান্দারও খেয়াল ছিল যে নিজের খেত-খামার বাড়ীঘর সাজিয়ে তুলবে।

বিলিয়া ছিল চান্দার ছেলেবেলাকার সঙ্গী। সেও শ্রমিকের কাজ শুরু করেছিল। নিজের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাদের পুরনো জীবনে ফিরিয়ে নেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু নতুন ও ফেলে আসা জীবনের মধ্যে দূরত্ব ছিল খুবই দীর্ঘতর। চান্দার জীবনে এতো কষ্ট কখনো আসেনি। প্রখর রোদে ইঁটের খোয়া ভাঙতে ভাংতে তার মনে হতো সেও যেন ভেঙে পুড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইঁটের গায়ে লেগে উত্তাপ যেন ক্রমে তার শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। এই উত্তাপ একদিন তার জন্য কাল হয়ে দেখা দিল। একই সাথে জ্বর ও কাশিতে সে আক্রান্ত হলো। কিন্তু সে বিলিয়ার সাহচর্যে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করলো। ফলে একদিন বিলিয়ার দুর্বল কাঁধের বোঝায় পরিণত হলো। এ সময় তার সামনে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না।

এক রাতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, নদীতে বান ডেকেছে। চান্দা তখন বস্তির ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘটনাক্রমে প্রফেসর পীতাঞ্জলিও এ সময়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। হঠাৎ বিজলী চমকালে সে চান্দাকে দেখে ফেললো। সাথে সাথে চান্দার কাশি শুনলো। যেন বিজলীর স্পর্শে তার কাশি হয়েছে। প্রফেসর কাছে গিয়ে বললো, মেয়েমানুষ এদিকে কি করো।

চান্দা কি বলবে কি জবাব দিবে ভেবে পেল না, মৃত্যুর ইশারা তাকে পেয়ে বসেছিল। সে অস্ফুট স্বরে কাঁদতে লাগলো।

সব কিছু ভেসে গেছে ?

চান্দা কথা বলল না।

আপনজন কেউ আছে ?

না।

আমার সঙ্গে যাবে ?

চান্দা আবার কাঁদতে লাগলো।

প্রফেসর বললো, আমার সঙ্গে চলো।

চান্দা মাথা নীচু করে প্রফেসরকে অনুসরণ করলো।

কয়েক দিন কয়েক রাত সে প্রফেসরের কামরায় কাটালো। পাড়ার কেউ জানতে পারল না। বুঝতে পারল না। তবে কাশি ও কান্নার শব্দ শুনে অনেকে অবাক হতো, ভাবতো, কার উনুন শীতল হলো কে মারা গেলো। কিন্তু গিয়ে খবর নেওয়ার সময় কারো ছিল না। সন্ধ্যায় প্রফেসর ফিরে এসে চান্দার জন্য খাবার তৈরী করতো, তারপর রাত কাটানোর জন্য পরীস্থান রেস্টুরেন্টে চলে যেতো।, এ অবস্থাও বেশী দিন চলতে পারল না। মাখন বাওয়ার অনুচরদের সন্ধানী চোখ চান্দার উপর পড়ে গিয়েছিল। মাখন বাওয়া ছুটে এলো। ততক্ষণে চান্দা বৃদ্ধ টাঙ্গাচালক মখিয়ার ঘরে গিয়ে উঠেছে। মখিয়া রাতদিন আড্ডায় পড়ে থাকতো, বাসায় ফিরতো কম। চান্দা সেখানে পিতৃস্নেহ লাভ করলো। মখিয়া চান্দাকে নিজের মেয়ে মনে করতে শুরু করেছিল। পয়সা হাতে এলে তার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসতো। এ সময়ে প্রফেসর মহল্লাবাসীদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছিল, মনে হতো সে যেন একটা কাজ পেয়ে গেছে। বাইরে থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে চান্দার কাছে চলে যেত। শিয়রে বসে বলতো, তোর জন্য ফল এনেছি ওষুধ এনেছি।

চান্দা খুশী হতো, সে এখানে অভাবনীয় মায়া মমতা লাভ করে-ছিল। একদিকে ছিল মখিয়া, ঘরে এসেই চান্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরতো, যেন নিজের বৃদ্ধ হাড়ে তার সব রোগ মিশিয়ে নেবে। তার বুকের সাথে লেপেট চান্দা কান্নায় ভেঙে পড়তো। তার মনে হতো মুহূর্তের জন্য তার হারানো সবকিছু সে ফিরে পেয়েছে। অন্যদিকে

মুগ্ধ মনে ভেসে উঠতো প্রফেসারের ছবি। প্রফেসর তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজ পর্যন্ত সে চান্দার সাথে প্রীতি উচ্ছ্বাসময় একটি কথাও বলেনি। কাছে এসে বসলে শুধু বলতো, তোর জন্য ফল এনেছি ওষুধ এনেছি। কিছুক্ষণ পর বাতাসে হাত দুলিয়ে চলে যেতো। পাড়ার ছেলেরা তার পেছনে ছুটে যেতো, চান্দারও মন চাইতো ছুটে যায়। একবার তো নিজের অজ্ঞাতেই সে প্রফেসরের পেছনে ছুটে গিয়েছিল। বহুদূর গিয়ে উন্মনার মতো দাঁড়িয়ে রইলো, হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠলো। তোমার জন্য ফল এনেছি, ওষুধ এনেছি। চান্দা তখন নিজের কামরায় ছুটে আস্‌লো।

কখনো কখনো চান্দা মাখন বাওয়াকেও দেখে ফেলতো, কিন্তু তাকে দেখেই দুচোখ বন্ধ করে ফেলতো। তার মনে হতো সে যেন মন্দিরের পুরোহিত নয় আস্ত একটা বাটপাড়। চান্দার মনে পড়লো, একবার তাদের গ্রামে এক বাটপাড় এসে বহুকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মাখন বাওয়ার চোখে চান্দা সে দৃষ্টি দেখতে পেলো। গ্রামের সেই বাটপাড় থেকে চান্দা আত্মরক্ষা করেছিলো, বন্যা থেকেও রক্ষা পেয়েছিল অথচ ডুবে মরতেও তার আপত্তি ছিল না। এখন মানুষের বন্যার ছোবল থেকে তাকে রক্ষা পেতে হবে।

বিমিয়ার সাথে, প্রফেসরের সাথে, মথিয়ার সাথে মেলামেশা করে তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের বুকের সাথে মিশে গিয়েও চান্দা কখনো ভয় পেতো না, আতংকিত হতো না অথচ মাখন বাওয়ার চোখের দিকে তাকালেই সে ভয় পেয়ে যায়। মাখন বাওয়া যেন তার সুন্দর সুন্দর ধারণাকে এক থাপ্পড়ে নিভিয়ে দিতে চায়। সে শৃগালের মতো চান্দার হালকা পাতলা দেহের কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়।

চান্দা কয়েকবার মন্দিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিল। অন্যান্য বহু মেয়ে সকাল বিকেল যেতো, কিন্তু মাখন বাওয়ার ভয়াবহ চোখের দিকে তাকিয়ে চান্দার মন্দিরে যাওয়ার সাধ মিটে যেতো। পাড়ার মেয়েরা তার কাছে এসে মন্দিরে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করতো, তারা বলতো, সেখানে গেলে সব রোগ ভাল হয়ে যায়। মনের কামনা পূর্ণ হয়। পুরোহিত যার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে তার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়।

চান্দা তাদের বলতো, আমাকে ওখানে যেতে প্রফেসরজী নিষেধ করেছেন। মাখন বাওয়াতো নাস্তিক, ভগবান মানে না।

মেয়েরা তাকে অসুখ ভাল হওয়ার পর মন্দিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাতো। সাথে সাথে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা বলোতো, প্রফেসর তোমার কে হয় ?

চান্দা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিত না, তার কাছে কোন জবাবও ছিল না। মথিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে চান্দা বলতো, তিনি আমার চাচা, তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। অনেক ভেবেও প্রফেসর সম্পর্কে সে কোন জবাব দিতে পারতো না। মেয়েদের বলতো তারা যেন এ সম্পর্কে প্রফেসরকেই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু প্রফেসর পীতাঞ্জলিকে এ প্রশ্ন কে জিজ্ঞেস করবে ? মাখন বাওয়াই এখনো জিজ্ঞেস করতে পারেনি। প্রভাত কয়েকবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, তার মুখে প্রশ্ন যোগাচ্ছিল না একদিন পাড়ার মেয়েদের আসার কথা চান্দা প্রফেসরকে জানিয়ে দিল।

পাড়ার মেয়েদের আসার কথা শুনে প্রফেসর খুশী হলো। বললো, সমবয়েসী মেয়েদের পেয়ে গেছ ভালই হয়েছে। এখানে নিজের বাড়ীর মতো, সুখ-দুঃখ সবার সাথে সমান ভাগ করে নেবে। এখন তুমি ভাল হয়ে যাচ্ছো একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এখানে কেউ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে আমি জেনে যাই তাকে সহজে মরতে দেই না।

চান্দা বললো, আমি কি কখনো মন্দিরে যাবো ?

প্রফেসর জিজ্ঞেস করতো কোনদিকের মন্দির ?

চান্দা বলতো, পাড়ার মন্দির।

প্রফেসর বলতো, না এদিকের মন্দিরে যেও না, বাড়ীর মালিক ভাল মানুষ নয়। ওদিকে ভাল মানুষওয়ালা মন্দির আছে, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, তারপর বাইরে দাঁড়াবো তুমি মূর্তি দর্শন করে এসো।

---কবে নিয়ে যাবে ?

---তুমি ভালো হলেই নিয়ে যাব। মথিয়াকে বলে রাখব, তার টাঙ্গায় করে যাবো।

কথা প্রসঙ্গে চান্দা ভয়ে ভয়ে প্রফেসরকে বলল যে, পাড়ার মেয়েরা জানতে চায় প্রফেসর তোমার কে হন ?

মেয়েরা কেন জিজ্ঞেস করে? প্রফেসরের সারা দেহ কেঁপে উঠলো।

চান্দা দোপাট্টার আঁচলে মুখ লুকিয়ে বলল, প্রতিদিনই ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে।

প্রফেসর কোন জবাব দিল না। তার কাছেও যেন এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। এ প্রশ্ন সম্পর্কে সে যেন কোনদিন ভেবেও দেখেনি। দীর্ঘক্ষণ সে ঘরে বাইরে পায়চারী করলো। চান্দা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। সে বুঝে ফেললো যে প্রফেসরের কাছেও এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। কিছুক্ষণ পর প্রফেসর তক্তপোষে বসে পড়লো, প্রফেসর একইভাবে পায়চারী করতে লাগলো। এক সময়ে চান্দার কাছে এসে প্রফেসর বলল, মেয়েরা জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, প্রফেসর আমাদের গাঁয়ের মানুষ, আমাকে চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে।

এই বলে প্রফেসর চলে গেল।

কিন্তু মেয়েরা প্রফেসর সম্পর্কে পরে যখনি চান্দাকে জিজ্ঞেস করতো সে কোন জবাব দিত না, হেসে এড়িয়ে যেতো।

বারো

চান্দার সাথে আলাপ করতে তাকে দেখতে কয়েকবারই প্রভাতের ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু ঘরের কাজ করে সময় পাচ্ছিল না। একজনের উপার্জনে তারা তিনজন চলছিল। অনেক চেষ্টার পর অমর টিম্বার মার্চেন্টের কোম্পানীতে একটা চাকরি জুটিয়েছিল। মাত্র দেড়শ টাকা বেতন। এ টাকায় মাসের দীর্ঘ ত্রিশ দিন তাদের পানাহার চলতো না। সুধীরও কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করতো কিন্তু প্রায় সবাই মায়ের নামে পাঠাতো। এ টাকার অধিকাংশই সে শকুন্তলার কাছ থেকে সংগ্রহ করতো। মাকে পাঠিয়ে বাকি টাকায় সিগারেট ক্রয় করতো। জন্মদিন উপলক্ষে শকুন্তলা তাকে একটা দামী স্যুট তৈরী করে দিয়েছিল। আসলে একটা ভাল স্যুট পাওয়ার জন্যই শকুন্তলার টাকাতেই সে একটা হোটেলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান করেছিল। প্রভাতকে সুধীর প্রায়ই বলতো আমি আসলে প্রতারণা করছি যদিও আমি প্রতারক নই কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে প্রতারক হতে। আমি কখনো মিথ্যে কথা বলিনি, অথচ এখন সবার সাথে মিথ্যে বলে বেড়াই। সবাইকে ধোকা দেই সবার সাথে প্রতারণা করি। এই প্রেম ভালবাসা সবই প্রতারণা। আমি বেঁচে থাকতে চাই, বাঁচার জন্যই শাকুন্তলার নিকট থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে ধার নিচ্ছি, নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হলে সব ছেড়ে দেব। প্রভাতের কাছে সুধীরের কথার কোন জবাব ছিল না। সে শুধু শুনে থাকতো। সুধীর চলে গেলে প্রভাত শুয়ে পড়তো। ভাবতো, কি দিনকাল পড়েছে ভালমন্দ সবাই এ রকম করতে বাধ্য হচ্ছে। যাদের সম্পর্কে কখনো খারাপ কিছু চিন্তাই করা যায়নি তারাও এখন অবলীলায় নিন্দনীয় কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে তার সুধীর, প্রফেসর পীতাঞ্জলি, অমর সবার কথা মনে এলো। সেদিন সে কাজ করতে করতে ভাবলো, একদিন হয়তো আমিও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে শুরু করে দেবো।

প্রফেসরের কণ্ঠস্বরে প্রভাতের চিন্তায় ছেদ পড়লো, প্রফেসর চান্দাকে নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রভাতকে আলুর খোসা ছাড়াতে দেখে চান্দাই এগিয়ে এসে বলল, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

প্রফেসর হেসে বলল, ওর নাম চান্দা।

প্রভাত হেসে বলল, এ পুতুল কোথা থেকে এনেছ?

প্রফেসর প্রভাতকে দেখিয়ে চান্দাকে বলল, আমাদের প্রভাত বাবু খুব ভাল মানুষ। তুমি আলুর খোসা ছাড়িয়ে ঘরে চলে যেয়ো, প্রভাত বাবু তোমার সাথে যাবে। আমি এখন কাজে যাচ্ছি, ডাক্তার যেভাবে বলেছেন সেভাবে ট্যাবলেট মিকচার খেয়ো। আমি বিকেলে আসব।

এই বলে প্রফেসর শূন্যে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

প্রভাত চান্দাকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

চান্দা মাথা নেড়ে জবাব দিল, হাঁ।

ডাক্তার কি বলেন?

ভালই বলেন।

এখন যে ভাল হয়ে যাচ্ছো, এটা কি ডাক্তার বলেছেন?

চান্দা মাথা নেড়ে জবাব দিল, হাঁ।

প্রভাত ঘরের সামনে একটা মাদুর বিছিয়ে বসে পড়লো। চান্দা আলুর খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে কড়াইতে ফেললো। সে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল। বাইরে বসে প্রভাত ভাবলো প্রফেসর কোথা থেকে এ মেয়ে সংগ্রহ করলো, ওর মধ্যে তো প্রফেসরের কথা কলির ঝলক দেখা যাচ্ছে। ওর দেহের গঠন-বিন্যাসে প্রফেসরের আকাঙ্ক্ষিত মেয়ের দৃষ্টিই তো প্রতিফলিত হচ্ছে। চান্দার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রভাতের শৈশবের স্মৃতি মনে পড়লো, বহু দিন পর চাঁদ যেন তার কাছে নেমে এসেছে, এসে বলছে, 'ও তোমার মালা', 'ও তোমার মালা' 'ও তোমার মালা'।

মালার কথা মনে পড়তেই প্রভাতের দু'চোখ জলে ভরে উঠলো। বিদেশে আপনজনের চিন্তা আপনজনের স্মৃতিও কতো কষ্টদায়ক কতো বেদনাদায়ক !

আর কি তৈরী করতে হবে?

আর কিছু লাগবে না।

আমি যাই?

হাঁ চলো, আমি তোমাকে রেখে আসি।

আমি যেতে পারবো।

না, প্রফেসর আমাকে তোমার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। সে এসেই জানতে চাইবে আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি কিনা, তখন আমি কি বলব ?

চান্দা হাসতে লাগলো ঠিক যেমন করে মালা হাসতো। এ হাসির সাথে তার শৈশবের হাসির কি মিল ! সব কিছু কাছে, সব কিছু দূরে।

শীতকালের শুরুতে মিষ্টি মিষ্টি রোদের আভা, নারী ও শিশুরা রোদ পোহাচ্ছে। কোথাও নড়বড়ে তক্তপোষ, কোথাও ময়লা ছেঁড়া চটের আড়ালে বসে ওরা সূর্যের সাথে মিতালী পাতিয়েছে। পরিচিত জনেরা, চান্দা ও প্রভাতকে দেখে ছোট ছেলেমেয়েরা হাসতো, এক দৌড়ে গিয়ে তাদের স্পর্শ করতো। হঠাৎ প্রভাতকে দেখে চান্দা এক দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল এবং তক্তপোষে সাদা চাদর পেতে দিল। প্রভাত ভেতরে গেলে বলল, বসুন।

এ চাদর কার জন্য পেতেছ ?

আপনি বসুন আমি চা করে আনি।

প্রভাত তক্তপোষে বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর চান্দা চা তৈরী করে আনলো, চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করলো, এসব তুমি কোথায় শিখেছ ?

কোন্ সব ? চান্দা শিশুর মত প্রশ্ন করে।

প্রভাত বলল, এতো ভাল করে খাবার তৈরী করা, চা তৈরী করা।

নিজের বাড়ীতে শিখেছি।

কোথায় ?

আমাদের গ্রামে। ওখানে আমাদের গরু ছিল মহিষ ছিল। একটা বাঘা কুকুর ছিল। কিন্তু সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বন্যা সব ভাসিয়ে নিয়েছে। বহু লোক মারা গেছে। আমি ও আমাদের বাঘা কুকুরটি বেঁচে ছিলাম বাকি সব স্রোতের টানে ভেসে গেছে।

চান্দার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো।

প্রভাত মুগ্ধ করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো।

চান্দা বলল, তারপর আমরা শহরে চলে এসে পরিশ্রম করে পেটের ভাত যোগাড় করতাম। কুকুরটিও সাথে এসেছিল, সারাদিন আমার সাথে থাকতো। একদিন সেও ছেড়ে গেলো।

কোথায় গেল ?

আমার পেছনে পেছনে আসছিলো। হঠাৎ ঠিকাদারের ট্রাকের নীচে পড়ে বিশ্রীভাবে থেঁতলে গেল। আমি পাঁচ টাকা খরচ করেছি।

বাঁচলো কুকুরটা ?

না বাঁচেনি। আমার গ্রামের নিদর্শন ছিল, তাও আর রইল না।

প্রভাত চান্দার চোখে অশ্রু দেখে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, প্রফেসর কেমন মানুষ ?

চান্দার অশ্রু নিমেষে হাসির আড়ালে হারিয়ে গেল। লজ্জায় সে মিইয়ে গেল।

প্রভাত হাসতে লাগলো। বলল, তুমি তাকে সত্যিকার অর্থে প্রফেসর বানিয়ে দিয়েছ।

চান্দা কিছু বুঝতে পারল না। প্রভাত বলল, আগে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতো, এখন কোথায় যেন ছোটখাটো একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। জান নাকি কোথায় ?

চান্দা বলল, আমি জানি না।

প্রভাত বলল, তোমার ভাল হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে আস্তে আস্তে সেসব কাজে লাগাচ্ছে।

খাবার খায় না নাকি ?

কে ?

প্রফেসর।

খায়। দৈনিক শুধু একবার করে খায়। যখন খাবার পাওয়া যায় তখন তার ক্ষুধা পায় তার আগে নয়। অদ্ভুত লোক। তোমার হাতের খাবার খায়নি ?

চাও খায়নি কখনো !

কেন ?

বলে যে, তুমি ভাল হয়ে নাও। আমি চাইনা যে, তুমি নিজের জন্যও খাবার তৈরী করবে। আমিই সব পারবো। আগুন, ধোঁয়া, এসব রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তুমি ভাল হয়ে উঠলে খাবার তৈরী করো, তখন খাব।

চান্দা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

প্রভাতও হেসে ফেলল।

দূরে সুধীরকে একটা মেয়েকে সাথে নিয়ে আসতে দেখা গেল। মেয়েটির পরনে ছাই রঙের শাড়ী একই রঙের কোট। সুধীরের পরিধানে নতুন স্যুট। মেয়েটির হাঁটার ভঙ্গী অপূর্ব। তবু তাকে দেখে মনে হয় তার সব কিছু সুধীরের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তার নিজের কোন অস্তিত্বই নেই। সুধীর উচ্ছল হাসিতে কথায় কথায় ভেঙে পড়ছিল। মেয়েটি লাজনম্রভাবে হাঁটছিল। একটি আত্মার সাথে আর একটি আত্মার একাত্ম হয়ে যাওয়ার নামই সম্ভবত প্রেম। দুটি দেহের কাঠামো ভিন্ন থাকে কিন্তু কথাবার্তা, চালচলন সব এক হয়ে যায়। চোখের পলক শুধু নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে বাকি সবই পরস্পরের মধ্যে হারিয়ে যায়। ওদের পাশাপাশি হাঁটতে দেখে প্রভাতের মনে হলো, ওরা পরস্পরের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, দুজন একই পরিবেশের সৃষ্টি। একই বীজের দুটি চারা, একই শিকড়ের দুটি গাছ। প্রভাত ও চান্দা মুগ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুধীর প্রভাতকে দেখে দূর থেকে ইশারা করলো। প্রভাত এগিয়ে গেল। চান্দা নীরবে তাকিয়ে রইলো। ওরা দুজনই তার জন্য নতুন।

সুধীর প্রভাতকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, শকুন্তলা।

শকুন্তলা লজ্জা পেলো।

প্রভাত নিঃসংকোচে বলল, আপনার কথা শুনেছি, যেরকম শুনেছি, আপনি দেখতে অবিকল সেরকম। সুধীরের দিকে ফিরে বলল শকুন্তলাজীকে এই নোংরা বস্তিতে নিয়ে এসেছ ?

সুধীর সশব্দ হেসে বলল, তুমি শকুন্তলাকে দেখতে চাচ্ছিলে, তার সাথে আলাপ করতে চাচ্ছিলে এজন্য নিয়ে এলাম। চান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রফেসরের চান্দা নাকি ?

প্রভাত বলল, হাঁ।

চান্দা চুপচাপ সুধীর ও শকুন্তলাকে দেখতে লাগলো। সুধীর শকুন্তলাকে চান্দার পরিচয় দিয়ে বলল, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। শকুন্তলা চান্দার দিকে এগিয়ে গেল। চান্দা তাকে দেখে হাত জোড় করে প্রণাম জানালো। দোপাট্টার আঁচলে মাথা ঢেকে ফেললো। শকুন্তলা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। অন্য মেয়েরা কাজ কাম রেখে এদের দিকে তাকিয়ে রইল। শকুন্তলা সুধীরকে বলল, খুবই লক্ষ্মী মেয়ে।

প্রভাত চান্দার সাথে সুধীরের পরিচয় দিয়ে বলল, উনি আমাদের সুধীর বাবু। চান্দা হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। আগে

সুধীরের সম্পর্কে সে শুনেছিল। প্রফেসর অনেক কিছু বলেছিলেন। সুধীরের চোখে-মুখে সে প্রফেসরের বর্ণিত আদল খুঁজছিল।

শকুন্তলার বুকের প্রীতিময় পরশ চান্দার মনে তার মায়ের গভীর স্মৃতি জাগরুক করলো। গ্রামের পাখী, ধানক্ষেত, জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত সব কিছু নিমেষে তার চোখের সামনে এসে হাজির হলো।

কিছুক্ষণ আলাপ করার পর চান্দা বলল, আপনারা বসুন, আমি চা করে আনি।

শকুন্তলা পুনরায় সোহাগভরে চান্দাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ নয় আর একদিন এসে তোমার হাতের চা খাব।

আবার কবে আসবেন? চান্দার জিজ্ঞাসায় শিশুর সারল্য।

শকুন্তলা বলল, একদিন আসব, তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব। যাবে না? গেলে তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব আর আসতে দেব না। যাবে তো?

চান্দা নেতিবাচকভাবে ঘাড় নাড়লো।

কেন যাবে না? শকুন্তলা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

এখানেই ভাল আছি।

আমাদের বাড়ী দেখতেও যাবে না?

ভাল হলে তারপর যাব। এখন তো আমাকে রোজ ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। ভাল হবার পর মখিয়া চাচার টাঙ্গায় চড়ে মন্দিরে যাব, আপনাদের বাড়ীও যাব।

শকুন্তলা হেসে বললো তোমার কোন কিছু প্রয়োজন আছে? চান্দা না-সচক মাথা দোলালো।

ওদের চলে আসার সময়ে চান্দা তাদের বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। বস্তির শিশুরা চান্দাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু চান্দা গম্ভীর মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার মনে হলো, আজ যেন আবার মা, ভাই, ভাবী, ভাইয়ের ছেলেমেয়ে গ্রামের মধুরতা-পূর্ণ জীবন ক্ষণিকের জন্য ফিরে পেয়েও সে হারিয়ে ফেলেছে। ভাবনার রাজ্যে তন্ময় হয়ে চান্দা দাঁড়িয়ে রইলো, হঠাৎ তার কানে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ তোর জন্য ফল এনেছি। ওষুধ এনেছি।

চান্দা একদৌড়ে ঘরে চলে গেল।

তেরো

উচ্চ অট্টালিকা থেকে বস্তির দিকে যে প্রেম পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে প্রেম বস্তির দিক থেকে অট্টালিকায় পৌঁছা প্রেমের চেয়ে অধিক পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। শকুন্তলার প্রেম ছিল সুন্দর একনিষ্ঠ ও পবিত্র। সে প্রেম বস্তির অন্ধকারময় পথ ধরে অগ্রসর হলো।

আস্তাবল মহল্লার ওপাশে ছিল শকুন্তলার বাড়ী। তার পিতা লালারাম শরণ সিং প্রথমে সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন। তারপর চাকরি ছেড়ে একজন শেঠের সহযোগিতায় মধ্যম ধরনের ঠিকাদার হলেন। তার তিন ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের নাম শকুন্তলা। শকুন্তলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী কুমুদিনীর গর্ভজাত। লোকে বলে, দীর্ঘকাল যাবত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কোন সন্তান হয়নি, প্রথম স্ত্রী এই দুঃখেই মারা যান। কিন্তু কুমুদিনী ছিল বুদ্ধিমান ও চতুরা, শহরের পরিবেশ, চালচলন সে দেখেছিল। পারিবারিক দিক থেকে ছিলো সেকেলে ধরনের। এজন্য সাধারণ মূর্খ মেয়েদের মতো মন্দির ও ঠাকুরের কাছে সন্তান কামনা করতো। এভাবে সন্তান কামনা করতে গিয়ে মাখন বাওয়ার সাথে তার সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হয়। মাখন বাওয়া তখন বাওয়া বীরগর নামে পরিচিত ছিলো। তার সাথে পরিচয়ের পর কুমুদিনীর পেটে সন্তান আসতে লাগলো। প্রথমে একটা মেয়ে, তারপর একে একে তিনটা ছেলে। মাখন বাওয়া এখন তাদের পরিবারের গুরু। আগে আস্তাবল মহল্লায় মাখন বাওয়াও চটের পর্দার আড়ালে থাকতো, শুকনো রুটি খেয়ে ঈশ্বরের ভজন গাইতো। কণ্ঠ ছিল বেসুরো, কিন্তু চেহারা-সুরতে মন্দ ছিল না। ভগবান তার বেসুরো কণ্ঠের আকুতি শোনেননি বটে তবে আশপাশের কুশ্রী কুৎসিত লোকেরা তার চেহারা পছন্দ করলো। চেহারা পছন্দ হওয়ায় কণ্ঠস্বরও তাদের ভাল লাগলো। তার কাছে লোকজনের যাওয়া আসা বেড়ে গেল। সে

সময় আস্তাবল মহল্লা ছিল বিরান ও জনশূন্য। কিছু মূর্তি ও মাখন বাওয়া ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না। লোকজনের আসা যাওয়ায় মাখন বাওয়ার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো না। যৌবনে যে কারণে সে বহুরূপী সেজেছিল তারও কোন হিল্লে হলো না। সে ছিল এক সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান। কিন্তু কালের চক্রে তাদের পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। বিলাসিতার সব উপকরণ একে একে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর সে নিজেকে প্রশ্ন করলো, এখন কি হবে? জবাব পেলো সাধু হয়ে যাও এবং এমন আসন গ্রহণ করো যা সব কিছু দেবে। এ বুদ্ধি তার মাথায় চমৎকার বলে মনে হলো। তখন সে বীরসিং বাওয়া বীরগর হয়ে গেল। হিন্দুধর্মের একটা দিক আঁকড়ে ধরে সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলো। কিন্তু মোক্ষ লাভ সহজে ঘটলো না। ভগবানের ভজন গেয়ে প্রতীক্ষা করতে করতে বহু দিন অনেক রাত কেটে গেল। একদিন হঠাৎ সুদনী নামের একজন মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হলো। মহিলার দৈহিক আকর্ষণ এবং আর্থিক সচ্ছলতা দুটোই ছিলো প্রচুর। সেই মহিলার মাধ্যমে বড় বড় ঘরের সাথে পরিচয় হলো, মাখন বাওয়ার দিন ফিরে গেল। প্রতীক্ষার ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভরা দিনগুলির অবসান হলো, মূর্তি আগের মতোই পড়ে রইলো কিন্তু মাখন বাওয়ার পরিবর্তন ঘটলো। তাঁর পোশাক পরিবর্তিত হলো। পেশার পরিবর্তন হলো। বাসস্থানের পরিবর্তন হলো। যে সত্যিকার ক্ষুধাকে সে বহুদিন যাবত অন্যসব অপ্রয়োজনীয় অপ্রাকৃতিক ক্ষুধার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে ক্ষুধা ভয়ানকভাবে জেগে উঠলো।

মাখন বাওয়া সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যেতো, আস্তাবল মহল্লার বাইরেও এ নিয়ে আলোচনা হতো। মহল্লার ভিতরে তার সম্পর্কে একটুখানি ইশারাই যথেষ্ট ছিল। প্রফেসর পীতাঞ্জলি অনেক চেষ্টা করেও মহল্লাবাসীদের তার বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে পারত না। মাখন বাওয়ার প্রতি এলাকাবাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধা বরং বেড়েই চলছিল। মহল্লা ছাড়িয়ে বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত মাখন বাওয়ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় লোকদের বড় বড় ব্যাপার থাকে, ছোট ছোট লোকরা সেসব শুনে বোঝার চেষ্টা করে, ভুল বুঝলে পরে অনুতপ্ত হয়। আস্তাবল মহল্লায় ভুল শোনা, ভুল বোঝার কোন অবকাশই ছিল না। তবু সুধীর ও শকুন্তলার এ নোংরা এলাকায় একত্রে চলা-

ফেরা মাখন বাওয়ার আলোচনাকে জীবন্ত করে তুললো। চান্দা এ সম্পর্কে কিছু জানতো না, অন্যকে কি বলবে। চান্দা সম্পর্কে মাখন বাওয়ার কানে খবর যাওয়ার পর সে ছটফট করলো, শিষ্যদের ধরে ঠেঙালো, যাকে তাকে গালাগাল করলো, কুমুদিনীকেও এক চোট নিলো। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। কুমুদিনীর বাড়ীতে গিয়ে শকুন্তলাকে নিয়ে এলো। তারপর চান্দাকে বাগে পাওয়ার জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করা হলো।

অমর সিং সব কিছু জানতো। কিন্তু এ সম্পর্কে সে সুধীর ও প্রভাতকে কখনো কিছু বলেনি। পরীস্থান রেস্টুরেন্টে বসলে সরদার ধনা সিং জোর করে তাদের কিছু শুনিয়ে দিতো। ধনা সিং আজ শকুন্তলা ও সুধীরকে কোথায় যেন মেষ চরাতে দেখেছে, পাকোয়ান খেতে দেখেছে, আনন্দে নৃত্য করতে দেখেছে। ধনা সিং ওদেরকে বলতো "হীর-রানঝা জুটি", তাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো এবং ওয়ারেস্ শাহের বইয়ের পাতা উল্টাতো। পাতায় পাতায় ওয়ারেস শাহের হীর গুন গুনিয়ে গান করতো। হীর-রানঝার ভালবাসার দুটি চোখের সামনে থর থর করে কেঁপে উঠতো। অমর সিং এর মনে হতো সে যেন নিজের সংসার সাজিয়েছে, নতুন জীবন লাভ করেছে, এমনিতে সরদার ধনা সিং প্রেমের ক্ষেত্রে তেরচা সম্পর্কের প্রবক্তা ছিল, সে সম্পর্কের পূজা করতো তা থেকে লাভবান হতো। এজন্য অমরকে প্রায়ই বলতো যে, সুধীর প্রেম করছে, খুব ভাল, খুব ভাল। প্রেম খুব ভাল জিনিস, পবিত্র খেয়াল, কাব্যে লিখেছে, যে প্রেম করে না সে আদমসন্তান নয়।

শকুন্তলার পিতা লালাশরণ শেঠের ডাক এসেছে। অভিভাবক হিসেবে অমর সিংএর যাওয়া উচিত, কিন্তু সে এসব ঝামেলায় জড়াতে প্রস্তুত ছিল না। পরীস্থান রেস্টুরেন্টে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে প্রভাত শকুন্তলার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং অবস্থা অনুযায়ী আলাপ করবে। প্রফেসর এবং ধনা সিং সাহায্যকারী হিসেবে তার সাথে থাকবে। কিন্তু কেন এইভাবে ডেকে পাঠালো? আলোচনার বিষয়বস্তু কি হবে? পরিস্থিতি কোন-দিকে মোড় নেবে? পুলিশী, ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে না তো? প্রভাত কিছুই বুঝতে পারল না, তার জন্য এটা ছিল একটা নতুন দায়িত্ব। তবু সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কারণ না গিয়ে

উপায় নেই। যাওয়ার দিন এখনো ঠিক হয়নি। কি কাজে যেন সে বাইরে গেছে। এ সময়ে মাখন বাওয়ার ডাক এলো। প্রফেসর এবং অমর সিংকে দলবলসহ বাসা খালি করে দেয়ার নোটিশ দেয়া হলো, মাখন বাওয়ার একজন পরিচিত পুলিশ কর্মচারী বাড়ীর চার-দিকে ঘোরাফিরা করছিল। চান্দার উপস্থিতি ছিল প্রফেসারের জন্য বিপজ্জনক, কারণ তার বিরুদ্ধে সহজেই অপহরণের অভিযোগ আনা যেতো। মাখন বাওয়া এর আগে সুধীর ও শকুন্তলার বিরুদ্ধে লেগেছিল কিন্তু সে ব্যাপার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলো। কারণ চান্দাকে তার খুব প্রয়োজন। প্রফেসরকে বের করে দিয়ে সে চান্দাকে তার মহলে তুলতে চাচ্ছিল।

সুধীর ও শকুন্তলার মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেছে। শকুন্তলা কিছুটা ভীতু, কিছুটা উচ্ছাসপ্রবণ, আবার কিছুটা দূরদর্শী প্রকৃতির মেয়ে। সুধীরের ব্যাপারে সে ভয় পেয়ে গেল এবং কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না। বিকেলে উভয়ে দূরে থেকে পরস্পরকে দেখতে পেতো, শকুন্তলা অশ্রুসজল চোখে সুধীরের দিকে তাকিয়ে থাকতো এবং ফিরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তো। শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাখন বাওয়া তার পিতামাতার চেয়েও বেশী উদ্বিগ্ন ছিল, তার মেয়ে যেন কোন ভুল পদক্ষেপ নিয়ে পরিবারের মুখে চুনকালি লেপন করতে না পারে এ ভাবনায় বিব্রত বোধ করছিল। সাতপাঁচ ভেবে একদিন সে প্রভাতকে ডেকে পাঠালো।

মাখন বাওয়ার বাস ভবন দেখে প্রভাতের নিজ রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি মহলের কথা মনে পড়লো। যতগুলো কামরা তার সবই আধুনিক আসবাব-পত্রে সাজানো। একটা হল কামরায় মাখন বাওয়া শিশুদের দর্শন দিতো, চিত্রশোভিত দেয়ালে বড় বড় মহাত্মাদের চিত্র টাঙ্গানো। মাখন বাওয়া ভেতরের কামরায় বসে আরাম করছিল। বাইরের হল কামরায় সে সবাইকে সাক্ষাৎ দেয়। সে কামরায় কয়েকজন লোক কীর্তন গাইছিল। তিনচারজন সাধু বসে বসে ধ্যান করছে। মাখন বাওয়ার আরামে বিঘ্ন হতে পারে এজন্য খুব নীচু স্বরে তারা কীর্তন গাচ্ছিল।

মাখন বাওয়ার শয়ন কক্ষে শুধু বিশেষ লোকেরাই প্রবেশ করতে পারতো। এ সম্পর্কে প্রভাত অনেক কিছু আগেই শুনেছিল। একজন সম্রাট বা নবাবের শয়নকক্ষের মতোই বিলাস দ্রব্যে ভরপুর ছিল

মাখন বাওয়ার শোবার ঘর। বহুদিন পর প্রভাত এরকম কামরা দেখেছে। তার মন চাইল সেখানেই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে, তারপর শুয়ে শুয়ে দেয়ালের ছবি দেখে। যেসব ছবি অনড় অচল তবু স্মৃতিময়। যেসব ছবি দেখে শ্রদ্ধায় দৃষ্টি নত হয়, কিন্তু সে মুহূর্তে প্রভাতের দৃষ্টি নুয়ে এলো না তবে তার মন হেসে উঠলো। এ সময়ে মাখন বাওয়ার দুজন বিশেষ সেবক তার কাছে এলো। তারা সম্ভবত প্রভাতের হৃদয়ে হাসি দেখতে পেয়েছিল। তাদের নিকট মাখন বাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করায় তারা বলল, গুরুজী ভিতরে শুয়ে আছেন। প্রভাত তার আগমন সংবাদ জানালে ভিতর থেকে ডাক এলো। প্রভাত ভিতরে প্রবেশ করলো।

ভিতরে প্রবেশ করেই প্রভাতের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। চার-দিকে সবুজ রঙের রেশমী পর্দা ঝুলছে, যেন আকাশের পরীরা নেমে এসেছে। মাখন বাওয়া শাহজাদার মতো কোমল বিছানায় শুয়ে আছে, ছয়টি মেয়ে তার হাত পা দেহ মালিশ করছে, একটা মেয়ে রওসনের তেল মালিশ করছে। প্রভাত ভিতরে প্রবেশ করে একটু ঝুঁকে মাখন বাওয়াকে প্রণাম করলো। মাখন বাওয়ার চোখ চকচক করে উঠলো। ইশারা পেয়ে তেল মালিশ করতে থাকা কমবয়েয়ী মেয়েটি ছাড়া অন্য সবাই বোধ হয় কীর্তন করতে চলে গেল। একজন সেবক ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে কীর্তনের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছিল। মাখন বাওয়ার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু হলো।

প্রভাত বাবু না ?

জ্বী হাঁ।

বসে পড়ো।

প্রভাত গালিচার উপরে বসলো।

সেই সরদার সাহেব কোথায় ?

কাজে গেছে।

কোথায় কাজ করে ?

এক টিম্বার মার্চেন্ট কোম্পানীতে।

বেতন কত পায় ?

দেড়শ টাকা।

আর কি জানি ওর নাম ?

সুধীর।

হাঁ। কেমন ছেলে সে ?

ভাল। উচ্চ শিক্ষিত ভাল পরিবারের ছেলে। চাকরির সন্ধান করছে।

মাখন বাওয়া হঠাৎ তিরিক্ষি কণ্ঠে বলে উঠল সে ব্যভিচারী, লম্পট, শকুন্তলা দেবীর সাথে কি শুরু করেছে। আত্মভোলা সরলা মেয়েদের এভাবে ফাঁসানো ভাল পরিবারের শিক্ষিত ছেলেদের কাজ ? এটা কি ভুলে গেছ তোমরা কোথায় কার এলাকায় থাকো ? আমি পুলিশে খবর দেব। একদিন সে জেলে পড়ে থাকবে। এসব লাম্পট্য এখানে চলে না, এটা তীর্থস্থান। এসব করতে হলে অন্য কোনো জায়গায় খোঁজ করে নাও, এখানে সম্ভ্রান্ত ভক্তরা বাস করে। ওদের আসা যাওয়া এখানে। এসব কাণ্ড শালা হারামখোর কামচোর প্রফেসার করাচ্ছে ; একটা নাস্তিক ভগবানের বস্তিতে প্রবেশ করেছে। আমি একদিন তাকে দেখে নেব, তার আগে তোমাদের দেখে নিতে চাই।

প্রভাত চুপ করে শুনছিল। মাখন বাওয়া মনের খেদ খানিকটা মেটানোর পর প্রভাত বলল, আপনি শুধু সুধীরের দোষ দিচ্ছেন, সুধীরের যতোটা দোষ, শকুন্তলার দোষও ঠিক ততোটাই। আপনি শকুন্তলাকে বুঝিয়ে বলুন, সে সুধীরের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেই পারে। ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি এগিয়ে যেয়ে থাকে আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

মাখন বাওয়া প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, সেটা আমার কাজ সে আমি দেখব'খন। কিন্তু আমি শাখা কেটে নিশ্চিন্ত হতে পারি না, আমি অন্যায়কে মূলসহ উচ্ছেদ করতে চাই। অন্যায়ের শিকড় তোমাদের কামরায় গজিয়ে বসেছে।

প্রভাত বলল, আপনার এ নোংরা বস্তিতে আমরা থাকছি বলেই কি আপনি সুধীরকে এতো কথা বলছেন ? চাকরি নেই, একটা চাকরি থাকলে, এখানে কে পড়ে থাকতো ? তার কাছে টাকা থাকলে কিছুতেই সে এখানে পড়ে থাকবে না। শকুন্তলার কথাও ভেবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে সুধীর যতোটা দায়ী শকুন্তলাও ঠিক ততোটাই দায়ী। আপনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এ সমস্যার সমাধান করুন।

একটা সমাধান হতে পারে।

সেটা কি ?

তোমরা এ জায়গা ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের দূরে, শহরে ভালো বাসা নিয়ে দেব। প্রফেসরসহ তোমরা এ জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।

কিন্তু সেই নতুন বাসার ভাড়া কে গুনবে ?

আমি তোমাদের চাকররি ব্যবস্থা করে দেব।

আপনি আগে আমাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিন, আমরা আপনা থেকেই চলে যাব এর পর কখনো এদিকে আসব না।

আমি চেষ্টা করব। মাখন বাওয়া গর্জন করে উঠলো।

প্রভাত কিছুই বুঝতে পারল না। ভক্ত মেয়েরা কামরার ভেতর ছুটে এলো।

মাখন বাওয়া প্রভাতকে বলল, এখন যাও, ওদের গিয়ে সব বুঝিয়ে বলো বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের জন্য সেটা ভাল হবে না।

প্রভাত কোনো জবাব না দিয়ে বাইরে চলে এলো। দেখল সরদার ধনা সিং দাঁড়িয়ে আছে।

কি, চললে ?

তুমি কি মনে করে ?

ভাবলাম গোলমাল বেধে না যায় এজন্য চলে এলাম। কি বলল ?

বলছে এ মহল্লা ছেড়ে দাও।

কেন ?

এতে সুধীর শকুন্তলা থেকে দূরে চলে যাবে। চাকরি এবং বাসা দিতে চায়।

সরদার ধনা সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, শালা ধোকা দিতে চায়, সুধীরকে মারতে চায়। এ চাল চলতে পারে না। তোমাদের যখন মন চায় তখন বাসা ছেড়ে যাবে, এর আগে নয়। কেউ তোমাদের কিছু করতে পারবে না।

প্রভাত চিন্তিতভাবে বলল, খামাখাই সুধীর বিপদ কিনে নিয়েছে। দিন মোটামোটি কেটে যাচ্ছিল, কোথা থেকে শকুন্তলা এসে জুটলো। এখন তো মাখন বাওয়া ক্ষেপেছে, একটা বিপদ বাধিয়ে ছাড়বে।

মাখন প্রফেসরের উপর ক্ষেপেছে নাকি ?

হা। সে বলে প্রফেসরকেও এ জায়গা ছাড়তে হবে। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত চান্দাকে বের করে দিতে হবে। মাখন বাওয়ার মতলব ভাল নয়। প্রফেসরের জন্য না জানি কি বিপদ ঘটিয়ে ফেলে। আমরা প্রফেসরের লোক, এজন্য আমাদের উপরও রুষ্ট।

সর্দার ধনা সিং গর্জন করে উঠলো---এটা তার বাবার জমিদারী নয় যে যাকে ইচ্ছা রাখবে যাকে ইচ্ছা তাড়িয়ে দেবে। আমি বেঁচে থাকতে প্রফেসরকে কে বের করবে? মাখন বাওয়ার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে দেখছি।

সর্দার ধনা সিং প্রভাতকে নিয়ে পরীস্থান রেস্টুরেন্টে চলে এলো। প্রফেসর ও সুধীর সেখানে অপেক্ষা করছিল।

প্রফেসর সব শুনে বলল, শালা কেঁদে মরবে। সুধীর আর শকুন্তলার বিয়ে হবেই হবে। মাখন বাওয়ার চোখের সামনেই হবে। আমি সব ব্যবস্থা করাবো, তার কথা একটাও মানা হবে না।

সর্দার ধনা সিং প্রফেসরের কাঁধে হাত চাপড়ে বলল, 'সাবাস! সাবাস !!

সুধীর গম্ভীরভাবে বসে রইল। অবসর সময় ভালভাবে কাটানোর জন্য সে শকুন্তলার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। এতে ব্যাপক পরিচিতি লাভ হয়েছে আর সেটা ভালবাসার রূপ নিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে এক পক্ষের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা অপর পক্ষের ধোকা প্রতারণাকে এমনভাবে আয়ত্ত করে নেয় যে, প্রতারাণা বা ধোকাবাজিকে তখন তার আসলরূপে চেনা যায় না। আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠতার আড়ালে সেটা চাপা পড়ে যায়। সুধীরের মনে প্রথমে কি ছিল সেটা বলা মুশকিল, কিন্তু এখন তার মনে যা আছে সেটা প্রফেসর, ধনা সিং ও প্রভাত ভাল করেই জানে। কিন্তু নিজের অবস্থার কারণেই সুধীর এরূপ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রফেসর মুখ থেকে বোমার মত আওয়াজ বের করে বলল, আমি শালা মাখন বাওয়াকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব।

আস্তাবল মহল্লা ছেড়ে না যাওয়ার ব্যাপারেই ছিল একমত। দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা চললো। বিকেলে প্রভাতের লালা রাম-শরণ শেঠের সাথে দেখা করার কথা ছিল। প্রফেসর এবং ধনা সিংও তার সাথে গেল। প্রভাত ভেতরে প্রবেশ করার পর এরা বাইরে পায়চারী করতে লাগলো।

চৌদ্দ

শকুন্তলা যেন প্রভাতের জন্যই অপেক্ষা করছিল। প্রভাতের ভেতরে পৌঁছার সময়ে সে জানালায় দাঁড়িয়েছিল ; আগন্তুককে দেখেই ছুটে এলো। তার পরিধানে সাদা শাড়ী। সাদা শাড়ী পরিহিতা শকুন্তলাকে খুবই সুন্দরী, মায়াবী ও নিষ্কলুষ মনে হচ্ছিল। প্রভাতকে দেখে যেন তার একটা কষ্টকর প্রত্যাশার অবসান হলো। মিস্টি হেসে কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু প্রভাত কাছে থেকে তাকিয়ে দেখলো তার চোখে অশ্রু।

কাঁদছেন কেন? প্রভাত জিজ্ঞেস করলো।

এমনিতেই। আপনাকে দেখে যেন একটা আশ্রয় খুঁজে পেলাম।

প্রভাত হাসলো। তারপর বললো, অল্প সময়ে এতো কিছু ঘটে গেলো অথচ আপনারা কেউই ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন এমনতো নয়।

তারপর প্রভাত মাখন বাওয়ার সব কথা শকুন্তলাকে শোনালো। শকুন্তলা সেসব শুনে বলল, চলুন, লনে গিয়ে বসি।

শেঠজী ভেতরে নেই?

তাঁর বন্ধু এসেছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন। তিনি চলে গেলে আপনি তাঁর সাথে আলাপ করবেন।

আমাকে কেন ডেকেছে?

পায়চারী করতে করতে তারা আলাপ করছিল।

সুধীর বাবু সম্পর্কে আপনার সাথে আলাপ করবেন।

এ ব্যাপার কি তিনি জানেন?

কি ব্যাপার?

আপনারা দুজন যে মেলামেশা করেন, পরস্পরকে পছন্দ করেন ---এ ব্যাপার!

হ্যাঁ।

আপনি বলেছেন?

না, গুরুজী বলেছেন।

মাখন বাওয়া ?

হ্যাঁ, তিনি মাতাজীকে বলেছেন যে, সুধীর একটা ভবঘুরে ছেলে। আস্তাবল মহল্লার বদমাশ ও লম্পটদের সহচর।

প্রভাত হাসলো, বলল, আপনি আপনার আম্মাকে কি জবাব দিয়েছেন ?

শকুন্তলা বলল, তিনি অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু আমি চুপ করে ছিলাম। আমার বাইরে যাওয়া-আসা বন্ধ, কয়দিন থেকে সুধীর বাবুর সাথেও দেখা নেই।

এসব তো বুঝলাম। এখন আপনার মতামত কি ?

আমি সুধীরকে বিয়ে করতে চাই।

আপনার আব্বা-আম্মার কি ইচ্ছা ?

আম্মা গুরুজীর ইচ্ছে অনুযায়ী আমার বিয়ে দিতে চান, আব্বা আমার পক্ষে থেকেও কিছু বলতে পারছেন না।

আপনি কি ভাবছেন ?

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব।

প্রভাত হাসলো। বললো, আপনি এতো দুর্বল এটা জানতে পারলে সুধীর নিজেই বিষ খেয়ে প্রাণ দেবে। আপনি তো অশিক্ষিতা নন যে, আপনার পিতা-মাতা যার তার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দেবেন!

শকুন্তলা বলল, আমি কোন প্রকার গোলমাল বা অশান্তি পছন্দ করি না। আম্মার অশ্রুকে ভয় পাই, আব্বার নীরবতায় আমার বুক জ্বালা করে। ঘরে কেউ আমার সাথে কথা পর্যন্ত বলে না। গুরুজী এমন সব কথা বলেছেন যা কিনা আজ পর্যন্ত আমি আব্বা-আম্মার মুখ থেকে নিজের সম্পর্কে শুনিনি। চুপ করে থাকতে হয় কারণ আমাদের পরিবারে তার অসামান্য প্রভাব।

শকুন্তলা রাগে ক্ষোভে অভিমানে কাঁদছিল। প্রভাত গভীর চিন্তায় পড়ে গেল! সে ভাবলো, অগর যে সব মেয়েকে ঘৃণা করে সম্ভবত শকুন্তলা তাদের অন্যতম। কারণ তার উর্মিলাতো কারো জন্যই মরতে প্রস্তুত হয় না। শকুন্তলার সাথে আলাপ প্রসঙ্গে প্রভাত নিজের অতীত স্মৃতির শূন্যতায় হারিয়ে গেল। শকুন্তলা যেন তার মালা। মালা তারই জন্য হাসে তারই জন্য কাঁদে। কিন্তু পরিস্থিতি মালাকে বাধ্য করেছে, যে-কোন মুহূর্তে সে প্রভাতের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে

পারে। শকুন্তলা হতাশ না হয়েও হতাশার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। সুধীর শকুন্তলাকে অবসরের সাথী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক অনেক গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে। সুধীরের নীরবতা তার গভীর প্রীতিময়তারই পরিচায়ক। যে প্রেম যে প্রীতি ধীরে ধীরে আত্মাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেয় সুধীর এখন সে অবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে শকুন্তলাতো প্রথম সাক্ষাতেই সুধীরকে আত্মনিবেদন করে বসেছিল।

হঠাৎ শকুন্তলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তার চোখের অশ্রু শুকিয়ে গেল, চেহারার উদাসীনতা কেটে গেল। সে যেন নিজের ধারণারই সবকিছু পেয়ে গেছে। নিজের জীবনের বসন্তের সৌন্দর্য সে যেন লাভ করেছে, সে শান্তি তাকে কখনো হারাতে হবে না।

শকুন্তলার আম্মার সঙ্গে চলে যাওয়ার পর সে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো। লনে বসে প্রভাত অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলো। শেঠ বললেন, ভেতরে আসুন।

প্রভাত নম্র বিনীত ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করলো। শেঠজী গভীর আন্তরিকতার সাথে প্রভাতকে স্বাগত জানালেন। তাঁর ব্যবহারে প্রভাত খুবই প্রভাবিত হলো। প্রভাতকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে শেঠজী কুমুদিনীকে ডেকে পাঠালেন। কুমুদিনী মধ্যম গড়নের এক সুন্দরী মহিলা। টিকলো নাক, স্বপ্নমাখা চোখ, খুবই শান্তশিষ্ট। শেঠজীর বয়স পঞ্চাশের অধিক কিন্তু কুমুদিনীর বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি বলে মনে হয়।

প্রভাতের পরিচয় জানার পর শেঠজী কথা শুরু করলেন। 'আপনি তো সবই জানেন, সুধীর ও শকুন্তলার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এতে আমার কোন আপত্তি নেই। তারা একে অন্যকে পছন্দ করে ভাল কথা। আমি সুধীরকে দেখেছি বেশ ভাল ছেলে। দরিদ্র, বেকারত্ব কোন সমস্যা নয়, আমিও একদিন এ রকম অবস্থার শিকার হয়ে ছিলাম। সময়ে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এতটুকু বলে শেঠজী কুমুদিনীর দিকে তাকালেন।

কুমুদিনী বললেন, শকুন্তলা সম্পর্কে গুরুজী কাকে যেন কথা দিয়েছেন। ছেলে একটা ফার্মের ম্যানেজার, ভাল বেতন, উচ্চ বংশ। তাছাড়া গুরুজীর কথা এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি শিক্ষিত মানুষ, পড়া লেখা শিখেছেন, ভেবে দেখুন তো গুরুজীর মতের বিরোধিতা করলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে!

প্রভাত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কিন্তু এ অবস্থায় আপনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। শকুন্তলার মতামতের মূল্য দেওয়া দরকার, সে শিক্ষিতা মেয়ে, ভাল পরিবারে তার জন্ম। আজকাল তো সাধারণ পরিবারেও মেয়ের মতামতের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

শেঠজী চাপা কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু গুরুজী আমাদের সাথে যোগাযোগ না করেই যখন কথা দিয়েছেন কি আর করা যাবে, তাছাড়া ছেলেও নাকি মন্দ নয়।

আপনি তাকে দেখেছেন ?

এখনো দেখার প্রয়োজন পড়েনি। গুরুজী নিশ্চয়ই দেখে শুনেই কথা বলেছেন।

প্রভাত হেসে ফেলল। বলল, যে সম্পর্ক আপনারও নয় গুরুজীরও নয় সে সম্পর্কের ব্যাপারে পাকাপাকি কথা কি করে দেয়া যায় ? এ রকম আলোচনা তো কতোই হয় কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় সবার মতামত নিতে হয়, এটা তো আপনার অজানা নয়, তাছাড়া সুধীর-শকুন্তলার ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে।

কুমুদিনী তিক্ত কণ্ঠে বলল, সুধীরই গড়িয়েছে।

প্রভাত সঙ্গে সঙ্গে বলল, যদি আমি বলি যে, এ ব্যাপার এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আপনার গুরুজীর হাত ছিল ?

কুমুদিনী কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মাখন বাওয়া ঘরে এসে ঢুকলেন। ওরা উঠে প্রণাম করলো। প্রভাত বসে রইলো। মাখন বাওয়া আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবে সোফায় বসে জিজ্ঞেস করলো, শকুন্তলা দেবী কোথায় ?

কুমুদিনী বলল, ওপরে আছে, মহারাজ ! ডাকবো ?

না না। মাখন বাওয়া চোখ বন্ধ করে কি যেন পাঠ করলো।

সবাই চুপচাপ বসে রইল। যেন মাখন বাওয়া এখনি মন্ত্র প্রয়োগ করবে। সবাই তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাইকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে প্রভাত শেঠজীকে বলল, আমি তবে চলি ?

শেঠজী চাপা কণ্ঠে বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবো, আপনাদের চাকরির ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ড্রয়িং রুম থেকে বাইরে বেরোবার সময়ে প্রভাত দেখল শকুন্তলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে চোখে চোখে কথা

হলো। বাইরে প্রফেসর ও ধনা সিং হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাতকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, কি খবর ভালতো ?

প্রভাত হেসে বললো, হাঁ ভালই।

প্রফেসর বললো, শালা বাড়ীওয়ালা মাখন বাওয়া এসে গেছে। নিশ্চয়ই সে কিছু বলেছে।

প্রভাত জবাব দিল, সে যা বলার আগেই বলেছে। এখানে কিছু বলেনি।

প্রফেসর বলল, ঝগড়া হলেই ভাল হতো, আমাদের মনের কথা মনেই থেকে গেল।

ধনা সিং জিজ্ঞেস করলো, কাজ হবে, নাকি, আমরা নিজস্ব ঢংএ আলোচনা করবো ?

প্রভাত বলল, সে রকম সম্ভাবনা তো বোঝা গেল না।

প্রফেসর বলল, শকুন্তলাকে দেখলাম তোমার সাথে কথা বলছে।

ধনা সিং বলল, আরে হীর কি বলছে, তার কি মতামত ? মা-বাবার কথায় গুলি মারো, হীর যা বলে তাই হবে।

প্রভাত হাঁটিতে হাঁটিতে বললো, সে তো সুধীরকেই বিয়ে করতে চায়। 'তার পিতামাতার ইচ্ছাও খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু মাখন বাওয়াতো খেয়ে না খেয়ে পেছনে লেগেছে। তাও এ কারণে যেহেতু আমরা প্রফেসরের লোক।

প্রভাত প্রফেসরের দিকে তাকালো। প্রফেসরের সারা দেহে যেন আগুন ধরে গেল। বলল, প্রফেসরের মানুষ কে নয় ? এদিকের সবাই প্রফেসরের মানুষ। মাখন বাওয়া কার কার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমি দেখব। শালা আমার হাতে মরবে। এই হাতে। প্রফেসর দুহাত শূন্যে প্রসারিত করে বলল।

তিনজন মাথা নীচু করে এগিয়ে চলল। সরদার ধনা সিংকে খুবই সচেতন মনে হলো ; তার নেশার ঘোর যেন কেটে গেছে। সে মনে প্রাণে সুধীর-শকুন্তলার মিলন কামনা করছিল। সে চায় হীর-রানঝা এক হয়ে যাক। এজন্য সে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে ছিল প্রস্তুত।

অমর কি চাচ্ছিল সেটা কারোই জানা ছিল না। এ ঘটনার কি ধরনের পরিসমাপ্তি তার কাম্য তাও কেউ জানত না। প্রফেসর পীতাঞ্জলি মাখন বাওয়ার ক্ষেপিয়ে তোলার কারণেই এগিয়ে এসেছিল।

তা না হলে সেও অমরের মতো নীরব ভূমিকাই গ্রহণ করতো। মনের কথা মনেই রেখে দিতো। এমনও হতে পারতো যে, কোন আকর্ষণই বোধ করত না। প্রভাত গোলযোগকে ভীষণ ভয় পেতো। এই ভয়ই তাকে মালার নিকট থেকে দূরে সরিয়েছে। সে চাইতো যে যা কিছু হয় যেন শান্তি ও সমঝোতার মাধ্যমে হয়।

সবাইকে নীরব দেখে প্রফেসর ধনা সিংকে কানে কানে বলল, আজও কি আবার হোটেলে সম্মেলন হবে ?

সম্মেলন হওয়ার অর্থ হলো মদের আসর বসবে কি না। কেননা এ যাবত অনুষ্ঠিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রফেসর তার কোটা যথাযথ পেয়েছিল। সম্মেলনের মাধ্যমে প্রফেসর তার একান্ত কাম্যবস্তু পেয়ে যেতো।

এজন্য সে কথায় কথায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করতো। আজও সে উদ্দেশ্যেই প্রস্তাব করেছে। ধনা সিং-এর নিকট থেকে কোন জবাব না পেয়ে প্রফেসর তার কাঁধে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি, হোটেলে সম্মেলন হবে কিনা ?

সর্দার ধনা সিং কিছুক্ষণ প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সম্মেলন হোক বা না হোক তুমি পান করতে পারবে। তুমি তো সম্মেলন নয়, পান করার জন্যই উদগ্রীব।

প্রফেসরের গম্ভীর চেহারায় হাসির চমক ফুটে উঠলো। সে চিৎকার করে বলল, আমরা জিতবো, জয় আমাদের হবেই। বুকে হাত দিয়ে বলছি। আমরা সবাই এক। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এ সময় মাখন বাওয়াকে প্রফেসর ইংরেজীতে মোটা মোটা গাল দিচ্ছিল এবং ধনা সিংকে বোঝানোর জন্য সেগুলোর অনুবাদও করছিল।

প্রভাত ও ধনা সিং মাথা নীচু করে হাঁটছিল। প্রফেসরের কথাও আজ তাদের ভাল লাগছিল না। আজকের বিকেলও কেমন ফিকে ম্লান হয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তাছাড়া সময়ের আগেই যেন চারিদিক আঁধারে ছেয়ে গেছে।

পনেরো

আস্তাবল মহল্লার শান্তি বিপন্ন হয়ে আসছিল, মাখন বাওয়া লোকদের নানাভাবে নাজেহাল করছিল। কারণে-অকারণে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহল্লার চারদিকে ঘুরে বেড়াতো। মহল্লার ভক্ত নারী ও মেয়েদের মাধ্যমে চান্দাকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য কয়েকবার উদ্বুদ্ধ করেছিল কিন্তু সে প্রত্যেকবারই অস্বীকার করেছে। অনেকে বলাবলি করছিল যে, নাস্তিক প্রফেসারের চান্দাও নাস্তিক, তারা ভগবান এবং ভগবানের পুরোহিতকে গালমন্দ দেয়। যুবতী মেয়েদের জন্য এটা ছিল একটা নতুন ব্যাপার। কারণ তারা মাখন বাওয়ার করুণাকে ভগবানের করুণার কাছাকাছি মনে করতো। অথচ চান্দাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। মাখন বাওয়ার কাছে গেলে চান্দার জন্য অসম্ভব সম্ভব হতে পারতো, সে বেহিসাব বিত্তের মালিক হতে পারতো, তার রোগ ব্যাধি সব ভাল হয়ে যেত। এদিকে চান্দা মন্দিরের দিক না মাড়ানোর ব্যাপারে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাখন বাওয়া। সাবিক মনোযোগ চান্দাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো, চান্দা যতোই তার নিকট থেকে দূরে থাকতে চাইতো, নিজের সম্ভ্রম রক্ষায় সে যত যত্নবান হতো, মাখন বাওয়া তাকে পাওয়ার জন্য ততোই পাগল হয়ে উঠতো। তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল।

একদিন রাতে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। মাখন বাওয়ার মাথায় খুন চেপে গেল। চান্দাকে তার চাই-ই চাই। মন্দিরের মূর্তির সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসলো। মূর্তি বললো, কি চাই?

মাখন বাওয়া বললো, চান্দা।

---শিষ্যরা কোথায়?

শিষ্যদের ডেকে আনা হলো এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে সবাই চান্দার কামরায় ছুটে গেলো। তারা তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মাখন বাওয়ার কাছে নিয়ে চললো। চান্দার মধ্যেকার নারী, নারীর পবিত্রতা কাঁদলো,

চিৎকার করলো কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে সে শব্দ কেউ শুনলো না। যা কিছু হচ্ছিল সেটা ছিল চান্দার জন্য সম্পূর্ণ নতুন। সে যখন তাকে অপহরণের কারণ চিন্তা করলো তখন তার মাথা ঘুরে গেলো, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেলো, বুকের স্পন্দন থেমে গেলো, চিন্তা ও কাজের অনুভূতি লোপ পেলো। সে কিছুই বুঝতে পারল না, কিছুই জানতে পারলো না।

সংজ্ঞা ফিরে এলে চান্দা দেখলো সে মাখন বাওয়ার সামনে বসে আছে। মাখন বাওয়ার ভয়াবহ চেহারা দেখে সে চিৎকার করে উঠলো। বাস্তব অবস্থা তার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে দেখলো তারই পরিচিত তিনটি মেয়ে সামনে বসে আছে।

পীত রঙের শাড়ী পরিহিতা রমিয়া। হাসি খুশী সুন্দর চেহারা। সতের আঠার বছর বয়স। একটা ভবঘুরে ছেলের পাল্লায় পড়ে সে বিয়ে ছাড়াই পরস্পরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করলো এবং একসাথে থাকতে লাগলো। জেলেটি পরিবেশের তাগিদে বাধ্য হয়ে জুয়াড়ী হয়ে গেল। অনেক রাতে বাড়ী ফিরতো। রমিয়া হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাতো। কিন্তু ছেলের চোখে তখন ত্রাস, এবং সংকেত ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। বাজিতে যেদিন জয়ী হতো সেদিন নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে থাকতো। এভাবে দিন কাটতে লাগলো। মন্দিরে। [illegible] ছিল কিন্তু সে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত [illegible] চোখ দিতো না। দিন কেটে যেতে লাগলো। তার স্বামী কিন্তু ফিরে এল না। কয়েক দিন কয়েক রাতের অন্ধকার পরও রমিয়া আলামোল মানুষের কোন হদিস পেল না। রমিয়া ছিল খুবই সুন্দরী। তার মায়াবী চোখের চাহনিতে পথচারীদের জন্য সাজানো ছিল অপরূপ আনন্দ। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যে কেউ তার দৃষ্টির অর্থ খুঁজে দেখল না। এদিকে পেটের ক্ষুধা ক্রমেই বাড়ছিল। সে ঘৃণ্য, জঘন্য, কঠিন ক্ষুধার শিকার হয়ে কয়েকদিন কাটানোর পর একদিন মন্দিরের দরজায় উঁকি দিল। আত্মা পালিয়ে গিয়ে দোকানপ্রবরদের খুঁজে ফিরলো, দেহ সে মন্দিরের চার দেয়ালে আটকা পড়ে রইলো। আত্মাহীন দেহ তখনো চান্দার সামনে মাথা নীচু করে বসে ছিলো। তাকে এ অবস্থায় দেখে চান্দা চমকে উঠলো, তার চোখ সচকিত হয়ে উঠলো নতুন জিজ্ঞাসায়।

সাদা শাড়ী পরা বিমলা বসে আছে। তিনটি ফুটফুটে সন্তানের জননী। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। তার ছেলে-মেয়েরা চান্দার কোলেই ঘুমিয়ে পড়তো। বিমলার স্বামী ভালো পরিবারের সন্তান ছিল, কিন্তু সঙ্গদোষে এক সময়ে সে মাখন বাওয়ার শিষ্য হলো। সেখানে রুটি, ভাং, চরস, থাকার জন্য একটা কামরা সবাই পেলো। বিনিময়ে স্ত্রীর দেহ-আত্মা মাখন বাওয়ার হাতে তুলে দিলো। স্বামী নেশার ঘোরে অচেতন হয়ে থাকে আর সন্ধ্যা হতে না হতেই বিমলাকে মাখন বাওয়ার অঙ্কশায়িনী হতে হয়। এভাবে রাতের পর রাত কেটে যায়, ছেলেমেয়েরা অন্য কামরায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বিমলার মুখের মিষ্টি হাসি কোন অবস্থায়ই ম্লান হয়নি, তার মুখে হাসি লেগেই থাকতো। এখনো সে চান্দাকে দেখে হাসছিল।

সাদা শাড়ী পরে লক্ষ্মী বসে আছে। বহু দূর থেকে এসেছে। তার পিতা ছিল মাখন বাওয়ার সেবক, তারই কাছে থাকতো, সেখানে খেতো। একদিন সেখানেই তার মৃত্যু হলো। মাখন বাওয়ার গ্রামেই ছিল লক্ষ্মীর বাড়ী। মাখন বাওয়া সম্পর্কে সে সবই জানতো, এজন্য লক্ষ্মীর প্রতি সে লম্পট ছিল খুবই উদার, খুবই সহানুভূতিশীল। অনাথিনী লক্ষ্মী পিতার মৃত্যুর পর মাখন বাওয়ার কাছে থাকতো। মাখন বাওয়া একই সাথে ছিল তার পিতা এবং অভিভাবক। লক্ষ্মীকে বিয়ে দেয়ার জন্য মাখন বাওয়া একটা ভাল ছেলে খুঁজছিল যে কিনা তার সেবা করবে এবং সেখানেই থাকবে, তারপর একদিন লক্ষ্মীকে ছেড়ে সরে যাবে। লক্ষ্মী ছিল আসলেই লক্ষ্মী, সে লেখা-পড়াও কিছুটা শিখেছিল, মাখন বাওয়া তার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে নিজের টাকা-পয়সার হিসেবও লক্ষ্মীর কাছে রাখতো। কখনো কখনো বিমলা এবং রমিয়ার সাথে দেখা করার জন্য সে এদের কামরায় আসতো। সেখানেই আজ চান্দাকে দেখতে পেলো। চান্দার কাহিনী শুনে দীর্ঘক্ষণ সে নীরবে অশ্রুপাত করলো। সম্ভবত তার নিজের কাহিনীর সাথে এ কাহিনীর গভীর সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু সেখানে কেউ কান্নায় অভ্যস্ত ছিল না, সবাই অন্যের চোখে হাসির চমক খুঁজে বেড়াতো। মাখন বাওয়া এ হাসি-কান্নার জগত থেকে নিজের জগতে বিচরণ করছিল।

চান্দা লক্ষ্মীর কাছে বসলো। মাখন বাওয়া চোখ মেলে তাকালো। বলল, বাছা, মখিয়া দুমাসের ভাড়া দেয়নি এজন্য তোমাকে ডেকে

আনা হয়েছে। সে যদি ভাড়া না দেয় তাহলে কাল তোমাকে কামরা ছেড়ে দিতে হবে।

মাখন বাওয়া অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলছিল। যেন তার অনুচরদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

কথা চালু রেখে সে আরো বললো, বাছা সব ভাড়া ধর্মকাজে ব্যয় করা হয়, যদি ভাড়া পাওয়া না যায় তাহলে ভগবানের এ লঙ্গর-খানা চলবে কি করে?

চান্দা শিশুর মতো আঁচলে চোখ মুছে বলল, কিন্তু মখিয়া বলল সব ভাড়া নাকি মিটিয়ে দিয়েছে।

মাখন বাওয়া বললো, মিথ্যে কথা। ওরা সব পাপী দুষ্ট লোক। তুমিতো জানো না, আমার ভয় না থাকলে কবেই তোমাকে মদ্যপ, জুয়াড়ীদের হাতে বিক্রি করে দিতো, ওরা যে কি রকম কামচোর হারামখোর সেটা তুমি জানো না।

এক গ্লাস ভাং গলাধঃকরণ করে মাখন বাওয়া সিগারেট ধরালো। তার চেহারা বিকট ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। বাম পা সে বিমলার দিকে এগিয়ে দিল, বিমলা চোখ নীচু করে পা টিপতে লাগলো। চান্দা লক্ষ্মীর গা ঘেঁষে বসে রইলো।

মাখন বাওয়া বললো, তুমি মন্দিরে আসো না কেন? ভগবানের কাজ করাইতো স্ত্রীধর্ম। স্নান করে সর্বপ্রথম ভগবানের দর্শনে যাওয়াই তো নিয়ম।

চান্দা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমিতো আসতে চাই, গ্রামে থাকতে প্রতিদিন মন্দিরে যেতাম, কিন্তু এখানে প্রফেসরজী নিষেধ করে দিয়েছেন।

প্রফেসরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাখন বাওয়ার নেশার ঘোর কেটে গেল। সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, সিগারেটে লম্বা টান দিতে লাগলো। রমিয়া যেন এ অবস্থা সম্পর্কে জানতো, সে তাড়াতাড়ি ভাংএ পূর্ণ একটা তামার গ্লাস মাখন বাওয়ার কম্পিত ঠোঁটের কাছে রাখলো। গ্লাস শেষ করে মাখন বাওয়া লক্ষ্মীকে বলল, বাছা চান্দাকে চরণামৃত পান করাও। তোমরা সবাই খাও। খেয়ে দেয়ে যার যার ঘরে চলে যাও, চান্দাকেও রেখে এসো।

চান্দার চোখ খুশীতে চিকচিক করে উঠলো। কিন্তু লক্ষ্মীর চোখের রং ফিকে হয়ে এলো। সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের কামরায় চলে গেলো।

চান্দা রমিয়া ও বিমলার দিকে তাকিয়ে দেখল যে, তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পর একটা তামার থালা হাতে লক্ষ্মী ফিরে এলো। থালায় চারটা তামার কৌটো, তাতে পবিত্র চরণামৃত।

মাখন চোখ মেলে চান্দার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, লক্ষ্মী আসতেই চোখ বন্ধ করে ফেললো এবং গম্ভীর কণ্ঠে বলল, চরণামৃত, এগুলো এক চুমুকে খেয়ে ফেলো।

সবাই চরণামৃত পান করলো। কিন্তু অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কারো অসুবিধা হলো না। চান্দার জন্য ছিল সেটা সম্পূর্ণ নতুন। অনেক কষ্টে সে ভর্তি কৌটার পানীয় গলাধঃকরণ করলো। সাথে সাথে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, মাথা ঘুরতে লাগলো। অস্পষ্ট আলোয় সে দেখলো রমিয়া, বিমলা, লক্ষ্মী পালিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে মনে হলো ওরা তিনজন একটা পাথরের মূর্তি হয়ে তার পাশ দিয়ে কেঁদে কেঁদে চলে গেল। তখন সেখানে শুধু মাখন বাওয়া ও চান্দা বসে ছিল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। চটের পর্দা কাঁপছে।

প্রফেসর গীতাঞ্জলি প্রায়ই গভীর রাতে বাড়ী ফিরতো। চান্দাকে নিয়ে আসার পর সে একটা হোটেলে চাকরি নিয়েছিল। সেখানে অর্কেস্ট্রা পার্টিতেও কাজ করতো। দেড় দুশো টাকা মাসে হয়ে যেতো। চান্দার চিকিৎসার জন্য সর্দারের মামা কিং এর নিকট থেকে সে কিছু ধার নিয়েছিল, বেতন থেকে কিছু কিছু তারও শোধ করছিল। বাকি টাকায় কোনক্রমে তাদের ব্যয় নির্বাহ হতো। এ চাকরি এবং বাসস্থানের পরিবেশে সে সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল। তবু সে ছিল সন্তুষ্ট কারণ তার পরিশ্রম বৃথা যায়নি, চান্দা বেঁচে গেছে, নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। তার অসুখ ভাল হয়ে যাওয়ার পর স্বাস্থ্য আগের মতো ভাল হয়ে গেছে।

আজও অভ্যাসমাফিক প্রফেসর গভীর রাত্রে ঘরে ফিরলো। চান্দার জন্য সে একটা রেশমী শাড়ী নিয়ে এসেছিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে সে শাড়ী আবার দেখলো। ভাবলো, চান্দাকে এ শাড়ী খুব মানাবে, শাড়ী দেখে চান্দা কী যে খুশী হবে। এসব ভাবতে ভাবতে মোমবাতির উপর তার চোখ আটকে গেল, তার মনে হলো মিটিমিটি জ্বলা মোমবাতি যেন তাকে কিছু বলতে, কোন রহস্য জানাতে চায়। মোমবাতির প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে উঠে

বসলো এবং শাড়ী বগলে চেপে নিজের অজ্ঞাতেই চান্দার কামরার দিকে অগ্রসর হলো।

এতো রাতে কখনো সে চান্দার কাছে যায়নি। কিন্তু আজ সামনে রাত-দিনের পার্থক্য মুছে গেছে। ঘরের সামনে গিয়ে দূরে থেকে সে চান্দাকে ডাকলো, কোন সাড়া পেল না। ভেতরে প্রবেশ করে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখল যে বিছানা খালি পড়ে আছে। দিয়াশলাই নিভে গেলো। অন্ধকারে তার সামনে একটি ভয়াবহ চেহারা ভেসে উঠলো। মাখন বাওয়ার চেহারা। কাপড় সেখানেই ফেলে রেখে বৃষ্টি মাথায় প্রফেসর মাখন বাওয়ার বাসভবনে গিয়ে হাজির হলো। শয়নকক্ষের দরজা ভেতর থেকে খোলা, সন্তর্পণে বাইরে থেকে দরজা খুলে সে দেখলো, ভেতরে সবুজ রংএর বাতি জ্বলছে। চান্দা বিছানায় শুয়ে আছে, মাখন বাওয়া বালিশে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তার বুক কাঁপছে, মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। প্রফেসর এটুকু দেখেই বাইরে চলে এলো। অন্য কোণে কীর্তনের অস্পষ্ট শব্দ তার কানে এলো। হলরুমে অন্ধকার ছেয়ে আছে। কম্পিত দেহ কোন ক্রমে সামলে প্রফেসর দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখলো বাইরে তক্তপোষে কীর্তন গাওয়ার বাদ্যযন্ত্র পড়ে আছে। প্রফেসর লোহার চিমটা তুলে চাপা পায় মাখন বাওয়ার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো। বাওয়া এখন ভাং এর নেশায় চুর হয়ে সম্ভবত তার শিকার সম্পর্কে ভাবছে। প্রফেসর দুহাতে চিমটা তুলে বাওয়ার মাথায় সজোরে আঘাত করলো। মাখন বাওয়া প্রফেসরকে দেখে ফেলেছিল, সে শুধু বলেছিল প্রফেসর নাকি? মাখন বাওয়া হুঁ-সূচক জবাব দিয়ে জানালা খুললো এবং বৃষ্টির পানিতে চিমটার রক্ত ধুয়ে নিজের লম্বা জামায় মুছে তক্ত-পোষে পূর্বস্থানে রেখে দিল। তারপর শয়ন কক্ষে ফিরে এসে দেখলো মাখন বাওয়া রক্তাক্ত অবস্থায় স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে আছে। চান্দার কাছে বসে তাকিয়ে থেকে সে তাকে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু চান্দারও কোন সাড়াশব্দ নেই, যেন সে মরে গেছে। স্পন্দনহীন চান্দাকে কাঁধে চেপে প্রফেসর বৃষ্টিতে ভিজে ফিরে এলো এবং চান্দাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর চান্দার শীতল দেহে লেপ চাপিয়ে দিয়ে কিছু না বলে নিজের ঘরে ফিরে এলো। মোমবাতি তখনো জ্বলছিল। প্রফেসর সেটা নিভিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। যেন কিছুই হয়নি, সে কোন দুর্ঘটনায় অংশ গ্রহণও করেনি, কিছুই জানে না। সমগ্র এলাকা নীরবতায় ছেয়ে আছে ; গভীর সুপ্তিতে নিমজ্জিত চারিদিক।

ষোল

প্রফেসর সারা রাত অস্থিরতার মধ্যে কাটালো। যা কিছু ঘটেছিল এবং যেভাবে সে ঘটনাস্থলে পেঁাছেছিল সেটাও দুর্ঘটনার চেয়ে কম ছিল না। চান্দাকে বাইরে নিয়ে আসার পর তার পা অচল হয়ে এসেছিল, সামনের দিকে এগুতে পারছিল না। সারা দেহ কাঁপছিল। তার মনে হলো কোথাও আঁধার নেই। আলোয় চারিদিক ছেয়ে আছে। এমতাবস্থায় কেউ চান্দাকে তার কাঁধে দেখে ফেললে কি মনে করতো? চান্দা নীরব নিথর, স্পন্দনহীন, তার সংজ্ঞা ফিরে আসবে কখন বলা মুশকিল। চান্দাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে প্রফেসর তাকে কিছু বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বেরোলো না। চান্দার কাছে বেশীক্ষণ তিষ্ঠাতেও পারল না, কিছুক্ষণ থেকেই ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। রাতে নানা বিদঘুটে ভাবনায় সময় কাটালো। কয়েকবার চান্দার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হলো কিন্তু উঠতে পারল না। মারামারি গোলমাল প্রফেসর পছন্দ করতো না, সব সময় এড়িয়ে চলতো।

সকালে অভ্যাস মাফিক গোসল করার সময় দূরে থেকে চান্দার কামরার দিকে বারবার তাকালো। গোসল করে ঘরে ফিরে এসে জীবনের এসব আশ্চর্য ঘটনা ও পটপরিবর্তন সম্পর্কে ভাবতে লাগলো। আরো ভাবলো যে, মাখন বাওয়া নিশ্চয়ই পুলিশে রিপোর্ট করেছে। এখন হয়তো পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে আসছে। হাতকড়া তাকে বেঁধে ফেলার জন্য হা করে আছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে সে নিজের নতুন মঞ্জিল ও সম্ভাব্য যাত্রাপথ সম্পর্কে ভাবতে লাগলো। নিজের গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারে তার এতটুকু দুঃখ ছিল না, বরং দুঃখ হলো চান্দা এ ঘৃণ্য দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে। চান্দাকে সে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। নানাবিধ চিন্তায় তার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো, দ্রুত পায়ে সে চান্দার কামরায় গিয়ে পেঁাছলো। চান্দা বিছানায়

শুয়ে আছে, প্রফেসরকে দেখে উঠে বসলো এবং তাকে জড়িয়ে ধরলো। প্রফেসর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো. চান্দা অস্ফুট স্বরে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর প্রফেসর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ওদিকে কি তুমি নিজেই গিয়েছিলে ?

চান্দা না-সূচক জবাব দিল ?

কে নিয়ে গিয়েছিল ? ওখানের মেয়েরা ?

না।

তবে কে ?

পুরোহিতের অনুচররা।

তুমি গেলে কেন ?

ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে।

তুমি হৈ চৈ করেছিলে ?

হাঁ।

কেউ আসেনি ?

না।

ওখানে অন্য আর কে কে ছিল ?

লক্ষ্মী, রুগিয়া, বিমলা ছিল। ওরা এখানে আসেনি। আমার যাওয়ার পর কাছে এসেছে। ওরা আমাকে চরণামৃত খাইয়ে চলে গেছে, তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

পুরোহিত কিছু বলেছিল ? প্রফেসর ভয়ার্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

না সে চুপচাপ বসেছিল।

প্রফেসর বলল, তুমি একদম ঠিক।

চান্দা লজ্জা পেলো।

প্রফেসরের চেহারায় খুশীর চমক খেলে গেল। বলল, একটা শিয়ালের হাত থেকে বেঁচে গেছ। এখন ওখানে বিছানায় গিয়ে বসো।

চান্দার সারা দেহ কাঁপছে, সে অস্ফুট স্বরে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার মাথা ঘুরছে।

প্রফেসর বলল, ও কিছু নয়। আমি এক্ষুণি তোমাকে চা করে দিচ্ছি। তুমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকো। চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুম থেকে উঠে দেখবে একদম সুস্থ হয়ে পড়েছ।

চান্দা চুপচাপ বসে রইল।

প্রফেসর চা তৈরী করার জন্য পানি বসিয়ে দুধ নিতে লাগলো। চান্দাকে এ অবস্থায় দেখে সে গত রাতে রোধ করা অশ্রু এখন আর

চেপে রাখতে পারলো না। তার কপোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জীবনে সে কখনো কাঁদেনি, তার চোখ যেন কাঁদতে জানতো না। যারা কাঁদতো তাদের সে ভীষণ ঘৃণা করতো। কিন্তু আজ সেও কাঁদলো, তার অনভ্যস্ত চোখেও অশ্রুর জোয়ার নামলো। সম্ভবত সে আজ চান্দাকে শেষ বারের মত নিজের হাতে চা করে খাওয়াচ্ছে।

এখনো সূর্য ওঠেনি। প্রতিদিনের মতো মহল্লাবাসী আজো ঘুমিয়ে আছে। সূর্যোদয়ের পরই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। সে যা চায় না তাই নিমিষে ঘটে গেছে। মাখন বাওয়া যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তার ফাঁসি হবে। যদি বেঁচে যায় তবে জেল হবে, কতোদিনের জেল হবে সেটা সে জানেনা। জেল থেকে মুক্তি পেলেও বেঁচে থেকে কি লাভ, জীবন আর কি জন্য? কাঁদতে কাঁদতে সে হেসে ফেললো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আবার চমকে উঠলো। পায়চারী করতে করতে সে নিজের সঙ্গে কথা বলছিল : ভালই হয়েছে। আমি যা কখনো ভাবিনি কিছুতেই হবে মনে করিনি তাই হয়েছে, ক্ষণিকের মধ্যে হয়ে গেছে। আমার হাতে সে মরতে চাচ্ছিল তাই মেরেছি। আমি বলব যে আমিই মেরেছি কিন্তু কেন মেরেছি কি জন্য মেরেছি। আমি বলব না। আমি চান্দার কথা বলব না, সে ভাল মেয়ে, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবে।

পায়চারী শেষে চা তৈরী করে সে চান্দাকে খাওয়ালো। চান্দা চা খেলো। প্রফেসর তার কাছে গিয়ে বসে তার অশ্রু-সজল চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন সেখানে নিজ জীবনের ছড়ানো ছিটানো মুক্তো খুঁজে ফিরছে।

প্রথমবারের মত চান্দার হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে সে বললো, একটা কথা তুমি নোট করে রাখবে। সেটা হলো, কি হয়েছে, কেন হয়েছে কারো কাছে কিছুই বলবে না। মখিয়ার কাছেও বলবে না। মনে করবে তুমি একটা স্বপ্ন দেখেছ। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছ। ঘুম থেকে জেগে সবার সঙ্গে মেলামেশা করবে, হেসে হেসে কথা বলবে। বান্ধবীদের সাথেও সহজভাবে মিশবে। এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই হয়নি। আমি মাখন বাওয়াকে মেরেছি। সে হয়তো মরে গেছে অথবা মরছে। নেশাতুর চোখে সে আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার নাম উচ্চারণ করেছে। তার অবস্থা যাই হোক না কেন

এখন পুলিশ এসে আমাকে জেলে নিয়ে যাবে, তুমি একটুও কাঁদবে না। এখানে মখিয়া আছে, প্রভাত বাবু আছে, সুধীর বাবু আছে, সর্দারজী আছে। এরা সবাই নিজের লোক। সবাই ভদ্র, এরা তোমাকে সাহায্য করবে। আমার অবর্তমানে ওরা রয়েছে, আমি ফিরে আসব, আমি ফিরে আসব।

প্রফেসরের চোখে আবার অশ্রু ছলকে উঠলো। তার মনও কেঁদে ফেললো। তার কণ্ঠস্বর কান্নায় জড়িয়ে এলো। প্রফেসর চান্দার মাথা নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে দিল। যে কাহিনী সে চান্দাকে শুনিয়েছে এটা চান্দার জানা ছিল না। সে চান্দাকে বাঁচিয়েছে কিন্তু কি ভাবে? সেটি সে জানতো না। সে শুধু জানতো যে সে স্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। স্রোতধারায় সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। হঠাৎ দেবদূতের মতো কোথা থেকে প্রফেসর এসে তাকে এমন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলো যে মৃত্যু সত্যিকার মৃত্যুর চেয়ে বীভৎস ও যন্ত্রণাদায়ক। অব্যক্ত আনন্দ ও প্রশান্তির আশায় চান্দা প্রফেসরের কোলে মাথা রেখে তার অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রথমবার সে কম্পিত হৃদয়ের গভীরে অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করলো। এক সময়ে প্রফেসরের চোখের জল নিজের হাতে মুছে দিল। আনন্দের আতিশয্যে অশ্রু আরো বেশী করে গড়িয়ে পড়লো। প্রফেসর হাত বাড়িয়ে চান্দাকে বলল, এখানে পঞ্চাশ টাকা রয়েছে, প্রয়োজন মতো খরচ করবে। আমার কাছে শুধু এই-ই আছে। বেশী থাকলে তাও দিয়ে যেতাম। মন অনেক কিছুই চায়, কিন্তু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

চান্দা নীরবে প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

প্রফেসর আরো বললো, টাকাগুলো লুকিয়ে রাখবে, চুরি হয়ে যেতে পারে। মখিয়ার কাছে ভালমন্দ লোক আসে। তুমি মারা যাবে না। কিছুতেই না।

চান্দার মনে হলো সে নদীতে ডুবে যাচ্ছে, তার হাত থেকে শেষ অবলম্বনটুকুও দূরে চলে যাচ্ছে।

লম্বা জামার আস্তিনে অশ্রু মুছে প্রফেসর বললো, এবার আমি চলে যাব, কিন্তু তুমি কাঁদতে পারবে না, কোন পুরুষ বা কোন নারীর কাছে কিছু বলবে না, কখনোই না।

প্রফেসর মাথা নীচু করে চলে গেল।

চান্দা অশ্রুভেজা চোখে প্রফেসরের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রফেসর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে সে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লো। সমগ্র এলাকা যেন নীরব নিথর হয়ে গেছে, সব কিছু যেন স্রোতের মুখে ভেসে গেছে। সে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। ছেয়ে যাওয়া নীরবতা ও স্রোতের মধ্যেও সে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, আমি আসব, তুমি কেঁদ না।

চান্দার সারা দেহে কাঁপন সৃষ্টি হলো, কম্পিত হাতে সে অশ্রু মুছে বিছানায় শুয়ে পড়লো। রাতের বিষাক্ত ভাং-এর প্রতিক্রিয়া তখনো কাটেনি।

প্রফেসর কামরায় পৌঁছে সংক্ষিপ্ত জিনিসপত্র পরিপাটি করে বিড়ি ধরালো এবং নিজের হাত দুটিকে হাতকড়ার জন্য প্রস্তুত করলো। তারপর এলোমেলোভাবে তক্তপোষে বসে পুলিশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। তার নিজেকে চোর, ডাকাত, খুনী কিছুই মনে হলো না তবু সে পুলিশের প্রতীক্ষা করলো। ইতিপূর্বে সূর্যোদয় হলো, মহল্লা-বাসীরা জেগে উঠলো। ক্ষুধার্ত শিশুরা কেঁদে কঁদে মায়ের দুধভরা স্তন খুঁজতে লাগলো। কিন্তু পুলিশ এলো না।

প্রফেসর ভাবলো সম্ভবত মাখন বাওয়া মরে গেছে, কাউকে কিছু বলার আগেই মরে গেছে। হাতের শিকল ছিঁড়ে গেল, পায়ের শিকল খুলে গেল, অজ্ঞাতসারে গলায় হাত দিয়ে সে ফাঁসির রজ্জু অনুভব করলো। তারপর তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলো।

মাখন বাওয়ার বাসভবনের সামনে কিছু সংখ্যক লোক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তারা কোন পবিত্র শোভাযাত্রার প্রতীক্ষা করছে। প্রফেসর সেখানে গিয়ে অন্যদিক থেকে ধনা সিংকেও আসতে দেখলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রফেসর সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলো। সবাই নীরব, কারো মুখে কোন কথা নেই। প্রফেসর সেবক-অনুচরদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের অবস্থা আঁচ করতে চেষ্টা করলো। ধনা সিং দূরে থেকে একজন জুয়াড়ীকে সম্বোধন করে বলল, পুরোহিতজীর অবস্থা এখন কেমন?

মাঝারি বয়সের একটা লোক সকাল বিকেল চরণামৃত পান করে জুয়া খেলার জন্য ধনা সিং-এর বৈঠকখানায় হাজির হয়। রাম নাম

জপে সে, ধনা সিং-এর প্রশ্নের জবাবে বলল, সরদারজীর জখম খুবই মারাত্মক, তবে ডাক্তার বলেছে আশংকার কোন কারণ নেই।

অন্য একটি সুস্থ সবল যবক যে কিনা নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়েকে কিছু ভাং, চরস খাওয়ার পর রমিয়ার প্রেমে উতলা হয়ে যায় এবং চোনাব নদীর তীরে বসে প্রেমিককে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে গল্প শোনাতে থাকে। হঠাৎ কি মনে পড়তেই চমকে উঠে বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিন্তু পুরোহিতজীর সংজ্ঞা ফিরে এসেছে।

প্রফেসর বলল, কিছু বলছে? প্রফেসর যেন নিজ জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত শুনছে।

যুবকটি হাই তুলে বলল, পুরোহিতজী হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করেছে।

একজন প্রৌঢ় লোক গায়ত্রীর মন্ত্র পাঠ করছিল। সে বললে, মহাত্মা মানুষ, হাসপাতালে গিয়ে কেন নিজের ধর্ম নষ্ট করবেন? এই বলে বৃদ্ধ তার নিকট থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে অবস্থিত মূর্তিকে মনে মনে প্রণাম করলো।

ধনা সিং কতকটা স্বগতভাবে বলল, পুরোহিতজী ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

মাঝারি বয়সের জুয়াড়ী জবাব দিল, ডাক্তারের জিজ্ঞাসার জবাবে পুরোহিতজী গম্ভীর স্বরে বলেছেন যে, রাতে তিনি আছাড় খেয়েছেন।

প্রফেসর কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তার আগেই রমিয়ার প্রেমে পড়া যুবক বলল, পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন।

প্রফেসর পীতাঞ্জলি যুবকের চেয়ে অধিক শীতলভাবে নিঃশ্বাস ফেলে এমন ভাব দেখাল যেন এ ঘটনায় যুবকটির চেয়ে সে কম দুঃখ পায়নি। তারপর পাশ ফিরে সরদার ধনা সিং এর কানে কানে বলল, এখান থেকে চলো, আমার চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।

এ সময়ে কুমুদিনী এবং শকুন্তলাও এসে গেল। কুমুদিনী গাড়ী থেকে নেমে মাখন বাওয়ার শয়ন কক্ষের দিকে চলে গেলো, তাকে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল, শকুন্তলা গাড়ীতে বসে রইল। কুমুদিনীকে যেতে দেখে প্রফেসর বলল, আশংকার কোন কারণ নেই, পা পিছলে পড়ে আহত হয়েছেন, লম্বা গভীর জখম কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, আশংকার কোন কারণ নেই।

প্রফেসরের কথায় ধনা সিং কষ্ট করে হাসি সম্বরণ করলো। একই নিঃশ্বাসে প্রফেসর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ধনা সিং তার ঠোঁটে হাত রাখলো এবং বাহু ধরে রেস্টুরেণ্টের দিকে নিয়ে গেল। ততক্ষণে পাড়ার নারী ও শিশুসহ বহু লোক এসে জড় হয়েছে। লক্ষ্মী এবং বিমলাকেও দেখা গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই।

প্রফেসরের হাত নিজের হাতে লুফে নিয়ে ধনা সিং বলল, আজ তুমি খোশমেজাজে আছো, চায়ের উপর গুল্লি মারো, আজ সকাল থেকেই পানীয় চলুক, তুমি সঙ্গে থাকবে না?

প্রফেসর দুষ্টুমীভরা চোখে ধনা সিং-এর প্রতি তাকিয়ে বলল. আগে চা খাবো। রাতের বিষাক্ততা এখনো পুরোপুরি কেটে যায়নি। চায়ের পানি দিয়ে সেটা চাঙ্গা দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষ পান করবো এবং তোমার সংগে এক সঙ্গেই তা করবো।

ততক্ষণে প্রভাত ও সুধীরও এসে পড়েছে। প্রভাত কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে প্রফেসর বলল, সুধীর বাবু, এক কুমারী মেয়ে এদিকে এসেছে, বলুনতো কে?

সুধীর ধনা সিং-এর প্রতি তাকালো, ধনা সিং তার কানে কানে বলল, শকুন্তলা।

শকুন্তলার কথা শুনেই সুধীর পিছটান দিল। পথে মাখন বাওয়া সম্পর্কে আলোচনা চললো, রেস্টুরেণ্টের কাছে এসে প্রফেসর নিজের ঘরের দিকে যেতে চাইলে সর্দার ধনা সিং তার বাহু ধরে বলল, চায়ের তেষ্টা উবে গেল?

প্রফেসর চাপা কণ্ঠে বলল, এক্ষুণি আসছি, একটা কথা মনে পড়েছে।

প্রফেসর লম্বা পায়ে চান্দার কাছে পেঁছুলো। চান্দা তখনো তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে অশ্রুপাত করছে। প্রফেসর বলল, তুমি ঘুমোও।

চান্দা উঠে বসলো, তারপর বলল, পুলিশ এসেছে?

প্রফেসর চোখ নাচিয়ে বলল, মাখন বাওয়া রাতের ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেনি। ডাক্তার এসে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনেছে, পট্টি বেঁধে দিয়েছে। ডাক্তারের জিজ্ঞাসার জবাবে মাখন বাওয়া বলেছে যে, রাতে পা পিছলে পড়ে গেছে। খুব চালাক লোক। রাতের ঘটনা প্রকাশ করলে তো নিজেরই সম্মান যাবে, দুর্নাম হবে, এজন্য বলেনি। না বলে ভালোই করেছে, তুমি দুর্নাম থেকে বেঁচে গেছ।

এখন পুলিশ আসবে না, মাখন বাওয়াও কারো কাছে বলবে না। সম্মানী লোক হতে চায়, নিজের মুখ রক্ষা করতে চায়। ভালই হলো। এখন আর পুলিশ আসবে না, আমাকেও জেলে যেতে হবে না। তুমি এখন আরাম করে ঘুমোও আর কেঁদোনা। কেঁদে কেঁদে তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ। ঘুমিয়ে তারপর উঠবে। খেয়ে দেয়ে আবার শুয়ে থাকবে। বিকেলে তোমার জন্য ভাল ফল ও এবং টনিক আনবো।

প্রফেসর আনন্দে আটখানা। চোখে মুখে হাসছে। তার কান্না-ভেজা চোখের অশ্রুবিন্দু অদেখা খুশীর ফুল হয়ে ঝিলের পানিতে সাঁতরাচ্ছে। সে দৃশ্য দেখে চান্দা আঁচলে মুখ লুকিয়ে ফেললো।

প্রফেসর সোহাগভরা কণ্ঠে বলল, কাঁদবে নাতো? চান্দা না-সূচক ঘাড় নাড়লো।

প্রফেসর গমনোদ্যত হলে চান্দা শিয়রের নীচে থেকে নোট বের করলো। প্রফেসর বলল, অর্ধেক নেব, বাকী অর্ধেক তোমার কাছে রাখবো। এই বলে কয়েকটা নোট লম্বা জামার পকেটে রেখে প্রফেসর চলে গেল। চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে চান্দা প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে গিয়ে প্রফেসরকে ছুঁয়ে ফেলে এবং তার চোখের খুশীর নাচন দেখে আবার ফিরে আসে। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে সে শুয়েই রইলো। প্রফেসরের চেহারায় সে হাসি-কান্নার অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করলো। যেন সে নিজের জন্য কাঁদেও নি, নিজের জন্য হাসেও নি। তার হাসি তার কান্না শুধু চান্দার জন্য। তার অস্তিত্ব যেন হাসি-কান্নার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে। চান্দা প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রফেসর বাতাসে হাত দুলিয়ে চলে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

সতর

দুর্ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলে মাখন বাওয়া ভালোই করেছে। ঘটনা সম্পর্কে লক্ষ্মী, বিমলা ও রমিয়া জানলো। লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে চান্দার অক্ষত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার খবর পেয়েই তারা বুঝেছিল এটা একমাত্র প্রফেসরের কারণেই সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্মী সকালে চান্দার সাথে দেখা করলো। চান্দা প্রফেসরের কথা অনুযায়ী এ ঘৃণ্য দুর্ঘটনাকে একটি দুঃস্বপ্নের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিল না। হেসে হেসে সে লক্ষ্মীর সাথে আলাপ করলো, অন্যান্য সময়ের সাক্ষাতে যেসব আলাপ করতো এবারও তাই করলো। রাতের ঘটনার ধারে-কাছেও গেল না। লক্ষ্মী চান্দার চোখের দিকে তাকিয়েই সব বুঝতে পারলো। ফেরার পথে শুধু বললো, চরণামৃত পান করেও তুমি রক্ষা পেয়েছ, চমৎকার ভাগ্য তোমার। যাক যা হয়েছে সব ভুলে যাও। চান্দা আগেই সেসব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মাখন বাওয়া বেঁচে গিয়েও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছার মতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যে-কোনো সময়ে তার মৃত্যুর আশংকা ছিল প্রবল।

একদিন সবাই দেখলো কুমুদিনীর গাড়ীতে চড়ে মাখন বাওয়া হাসপাতালে যাচ্ছে। সে দিনের দৃশ্য ছিল দেখার মতো। উজ্জ্বল রোদ চার দিকে ঝিলমিল করছে। নারী, শিশু, পুরুষ সবাই মন্দিরের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রফেসর পীতাঞ্জলী আগেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, অমুক দিন অমুক সময়ে প্রফেসর পীতাঞ্জলী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাবে। সবাই যেন তাকে বিদায় জানাতে আসে। কারণ প্রফেসরের মতে বাড়ীওয়ালা আর এখানে ফিরে আসবে না। এলেও যেভাবে যাচ্ছে সেভাবে আসবেনা। এজন্য মহল্লার সবাই মাখন বাওয়ার অন্তিম দর্শনের জন্য হাজির হলো। সুধীর, প্রভাত, প্রফেসর, ধনা সিং সবাই। ধনা সিং বারবার পকেট

থেকে বোতল বের করে প্রফেসরকে দেখাচ্ছে আর প্রফেসর শুকনো ঠোঁটে জিভ চাটছে। একসময়ে মাখন বাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। তাকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে মেয়েদের পালকিতে নিয়ে যাওয়ার মতো করে মোটরে পেঁাছানো হলো। মাখন বাওয়া নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সবার প্রতি তাকালো। সবাই তার রোগমুক্তির পর সুস্থ সবল প্রত্যা-বর্তন কামনায় একত্রিত হয়েছে ভেবে সে একটু বুঝতে চেষ্টা করলো। কেউ মাথা নীচু করেনি, হাত জোড় করেনি, নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। অনুচররা এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের চোখে আগের সে চমক নেই। তাদের চাহনীতে এখন আর দরিদ্র যৌবনবতী মেয়েরা মিইয়ে যায় না। প্রফেসর উজ্জ্বল সাদা পোশাক পরিধান করে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সে পরিপাটি করে চুল আঁচড়িয়েছে। তাকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। মোটর এগিয়ে চললে প্রফেসর ধীরে ধীরে অন্য কয়জনের সাথে এগিয়ে চলল, ঠিক যেমন মাখন বাওয়াকে মৃত্যুর দুয়ারে পেঁাছে দেয়ার জন্য এসেছিল। প্রফেসর মনের কথা মনে লুকিয়ে রেখেছে। কিছু দূর ফিরে এসে ধনা সিং-এর কাছে দাঁড়ালো। মাখন বাওয়া ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

মাখন বাওয়ার যাওয়ার পর পরই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, বহুদিনের নীরবতার পর সবাই মুখ খুলেছে। প্রফেসর সবার মনে নতুন চেতনা বোধের সৃষ্টি করেছে। প্রভাতকে কেউ কিছু বলেনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যা কিছু হয়েছে তাতে চান্দাও রয়েছে এবং মূলত প্রফেসরের কারণেই হয়েছে। আগে থেকেই প্রভাত ছিল মাখন বাওয়ার বিরোধী। নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কামরায় গিয়ে সে সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা চেতনা জাগিয়ে তুলল। তাদের বোঝাল যে, এ বস্তির মালিক তারা সবাই, মন্দিরের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। মাখন বাওয়ার মণিকাঞ্চনের প্রভাব মন্দির পর্যন্ত সীমিত। বাকি এলাকার মালিকানা তার নয়। বড় জোর সরকার তাদের নিকট থেকে ভাড়া নিতে পারে। তাও সে ভাড়ার এক চতুর্থাংশ দিয়ে আলো পানির ব্যবস্থা হতে পারে, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা হতে পারে। চটের পর্দার বদলে তারা কাঠের দরজা পেতে পারে পানির কল পেতে পারে, এভাবে তারা নতুন জীবন লাভ করতে পারে। এলাকার নগ্ন শিশুদের পোশাকের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেটা একদিনে সম্ভব নয়।

প্রভাত তাদের এমন ভাবে বুঝালো যে, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠলো, তারা নবচেতনায় হলো উজ্জীবিত। অন্যদিকে প্রফেসর পীতাঞ্জলি মাখন বাওয়ার ঘৃণিত জীবনের পর্দা উন্মোচন অভিযান শুরু করলো। এ ব্যাপারে সর্দার ধনা সিং তাকে সহযোগিতা করলো।

সুধীর নিজের কাজে ব্যস্ত রইলো। এলাকার পরিচ্ছন্নতা অপরিচ্ছন্নতা, মাখন বাওয়ার উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে তার কিছু আসতো যেতোনা। সে সারাদিন শকুন্তলাকে দীর্ঘ চিঠি লিখতো, সেসব চিঠিতে প্রচুর প্রেম নিবেদনের সাথে সাথে টাকার তাগিদ দেয়া হতো। শকুন্তলা প্রেমিকের টাকার দাবি মেটাতো। তারা দুজনে কখনো কখনো চুপিসারে দেখাসাক্ষাৎ করতো। অমর সিং একজন দায়িত্বশীল পিতার মতো নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, ছেলেদের এসব ব্যাপারে সে লক্ষ্য করতো না। ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে রাতের বেলায় এসেই ঘুমিয়ে পড়তো।

মাখন বাওয়ার বিরুদ্ধে লোকদের সংঘবদ্ধ করা সহজ ছিল না। একেত তাদের ঠাণ্ডা মাথায় কিছু শোনার মত অবস্থাই ছিলনা, দ্বিতীয়ত অনেকের মনে মাখন বাওয়ার প্রতি মর্যাদার অনুভূতি ছিল বদ্ধমল। মাখন বাওয়া চলে যাওয়ার পর তার প্রভাব বহুলাংশে কমে গিয়েছিল, তারপর প্রভাতের ক্রমাগত প্রচেষ্টা ভক্তদের মনেও আলোড়ন তুললো। কিছুদিন পর দেখা গেল সকল শ্রেণীর লোকজন পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে। বিকেলে বস্তির চেহারাই পাল্টে গেল। প্রফেসর, ধনা সিং, প্রভাত সবাই কাজে অংশ গ্রহণ করলো। আস্তাবল মহল্লায় নতুন পরিচয় যেন জেগে উঠলো। প্রফেসর মন্দির নতুন করে সাজালো। আলোয় আলোয় চারদিক ভরে উঠলো। শত শত হাতের সামনে দুনিয়া বদলে যায়, শতাব্দীর পুরনো পরিবেশ বদলে যায়, আস্তাবল মহল্লা তো একটা ছোট এলাকা। মানুষের সত্যিকার অনুভূতি হলো নদীর স্রোতের মতো, সে অনুভূতি জাগ্রত হলে মানুষের মনের ভুবন পাল্টে যায়।

মহল্লার পরিবর্তিত পরিবেশে প্রফেসর কথাকলির অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। নাচে গানে চারদিকে ভরে উঠলো। সরদার ধনা সিং-এর মতে সেদিন ছিল মূলত "মাখন বাওয়ার কবল থেকে মুক্তি দিবস।" এ অনুষ্ঠানে মাখন বাওয়ার অনুচর ও সেবিকাদের কাউকে দেখা গেল না, সম্ভবত তারা আলাদাভাবে কীর্তনের আয়োজন করেছিল।

আঠার

আস্তাবল মহল্লার অধিবাসীরা তাদের এলাকাকে সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন করে একটি অপরিচিত বস্তিকে নিজেদের বসত এলাকায় পরিণত করলো। সুধীর এবং শকুন্তলাও নতুন প্রতিজ্ঞা ও আত্ম-বিশ্বাসের সাথে নতুনভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা শুরু করলো। মাখন বাওয়ার হাসপাতালে যাওয়ার পর এক মাস কেটে গেছে। তার অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। নতুন নতুন রোগে জড়িয়ে পড়ছিল। হাতী যেমন ডোবায় পড়লে শত চেষ্টা করেও উঠতে পারে না, মাখন বাওয়াও তেমনি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সুস্থ হতে পারছিল না। নতুন রোগে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিল। এ সময়ে প্রফেসর পীতাঞ্জলি নতুন গুজব ছড়াচ্ছিল। কখনো বলছিল মাখন বাওয়া মরে গেছে, কখনো বলছিল মাখন বাওয়াকে মৃতাবস্থায় মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একবার মাখন বাওয়ার আদেশে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার ভাড়া চাইতে সাহস করেনি। ভাড়া চাইলে ভাড়াটিয়ারা ক্ষেপে গিয়ে মারতে আসে। মাখন বাওয়ার বিরুদ্ধে সবাই বিদ্রাহী হয়ে উঠেছে। মাখন বাওয়া এসব খবর যথাসময়েই পাচ্ছিল, এতে তার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটেছে।

শকুন্তলার অশ্রুবর্ষণের ফলে লালা রামশরণ সিং-এর মন গলে গেল। তিনি সুধীরের চাকরির জন্য চেষ্টা শুরু করলেন।

কুমুদিনী তার গুরু মহারাজের খবরাখবর নেয়ার ব্যাপারে এতটুকু অলসতা দেখাতো না। সকালে সে হাসপাতালে গিয়ে রাতে ফিরে আসতো। সুধীর ও শকুন্তলা সম্পর্কে চিন্তা করার মতো সময়ই তার ছিল না।

মাসের পর মাস চেষ্টা করেও যে দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি; এখন অল্পকালের মধ্যেই তা সম্ভব হয়েছে। শকুন্তলার চেষ্টা যত্ন কাজে লেগেছে। শহরের একটা বেসরকারী কলেজে

সুধীর অধ্যাপক মনোনীত হয়েছে। একদিন স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে শেঠজী শকুন্তলা ও সুধীরের বিয়ের কথা পাকা করে ফেললেন। প্রভাত এবং অমরও সেখানে উপস্থিত ছিল। মঞ্জিলের নিদর্শন পেয়ে সুধীর নিজের কাজে চলে গেল। আস্তাবল মহল্লা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন কলেজের হোস্টেলে অবস্থান করছে।

সুধীরের চলে যাওয়ার পর একটা রোমান্টিক ব্যস্ততার অবসান হলো। যাওয়ার আগে সে প্রভাত ও অমরের সামনে ভবিষ্যতের কর্মসূচী উত্থাপন করলো। তার খুশীর সীমা ছিল না। দক্ষ শিকারীর মত সে একই তীরে দুই পাখী শিকার করেছে। অমর এই ভেবে আনন্দিত হলো যে, তারা একজন অন্তত স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছে। কিন্তু প্রভাত দিনভর অশ্রু বর্ষণ করতো। সুধীরের বিয়োগব্যথায় সে মুষড়ে পড়েছিল। ধনা সিং পরীস্থান রেস্টুরেন্টে সুধীরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানালো। পাঞ্জাবী ভাষায় সে একটা বক্তৃতা করলো, তাতে নারী, মদ ও প্রেম সম্পর্কে চমৎকার বক্তব্য রাখলো। তার মতে এ তিনটি জিনিস ব্যতীত যৌবনের কোন দাম নেই। এ পৃথিবীর জীবন নীরস ও নিরর্থক। মাঝে মাঝে সে হীর-রান্‌ঝার কাব্যকাহিনী শোনালো। তার বক্তৃতা ছিল পাঞ্জাবী গদ্য-পদ্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো কারণ তাতে ছিল একটি অকৃত্রিম হৃদয়ের আন্তরিক অভিব্যক্তি।

প্রফেসরের সব কর্মসূচী যেন পূর্ণ হয়ে গেছে। সে এখন কোন পার্টিতে কোন সমাবেশে অংশগ্রহণ করতো না। অন্যদের সাথে মেলামেশাও খুব একটা করতো না। সুধীর ও শকুন্তলার বাগদানের পর সে হাসপাতালে ছুটে এলো। মাখন বাওয়া যদিও একটা বিশেষ কামরায় শুয়েছিল তবু সেখানে নিজ গৃহের শয়ন কক্ষের মতো আরাম পাচ্ছিল না। ব্যাণ্ডেজ তখনো খোলা হয়নি এজন্য তার বড় বড় চোখ দুটিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রফেসর তার কামরায় পৌঁছালো। মাখন বাওয়া নিষ্প্রভ চোখে মৃত্যুকে কাছে দেখে কেঁদে উঠলো। কুমুদিনী এবং লক্ষ্মীও সেখানে ছিল। কিন্তু তারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেনি। কারণ মাখন বাওয়া তাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যে মনে হচ্ছে ওদের সব গোপনীয়তা তার নখদর্পণে। নিরিবিলি পেয়ে প্রফেসর বললো, পুরোহিতজীর অবস্থা এখন ভাল ?

মাখন বাওয়া কোন জবাব দিল না।

প্রফেসর কৈফিয়তের সুরে বলল, আমি এতদিন খবর নিতে আসিনি, ভাবলাম পুরোহিতজী অসন্তুষ্ট হবেন।

মাখন বাওয়া ভয়ার্ত চোখে কাকে যেন সাহায্যের জন্য ডাকলো, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না।

প্রফেসর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো করে জিজ্ঞেস করলো, মহল্লাবাসী জিজ্ঞেস করছে, চিন্তা করছে, উপদেশ চাচ্ছে। কি উপদেশ দেবেন বলুন ?

মাখন বাওয়া তীক্ষ্ণ ছুরির খোঁচা সহ্য করতে না পেরে পার্শ্ব পরিবর্তন করলো, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

প্রফেসর বলল, আপনার সুধীর বাবুতো একটা বড় কলেজের প্রফেসর হয়ে গেছে।

মাখন বাওয়া আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, ঐ ব্যভি-চারী বদমায়েশকে কে চাকরি দিয়েছে ?

প্রফেসর হেসে বলল, পড়ালেখা জানা লোক, উচ্চ ডিগ্রী রয়েছে, সাহায্য পেয়েছে, সূত্র পেয়েছে।

মাখন বাওয়া ক্রোধে মাথার ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করে বলল, কে সাহায্য করেছে ?

প্রফেসর স্বাভাবিকভাবে বলল, শকুন্তলা দেবী সাহায্য করেছে. শেঠজী সাহায্য করেছেন। এতে সহযোগিতার সূত্র মিলে গেছে, অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে গেছে। এখন সে মহল্লা ছেড়ে কলেজ হোস্টেলে থাকছে।

মাখন বাওয়ার সারা দেহের রক্ত যেন চোখে জমা হলো। প্রফেসর এবার আসল কথা তুলে বলল, একটা কথা বলতে চেয়ে-ছিলাম কিন্তু পুরোহিতজী দুঃখ পাবেন এজন্য বলব না।

মাখন বাওয়া নিষ্প্রভ চোখে প্রফেসরের প্রতি তাকিয়ে বলল, আর কি কথা রয়ে গেলো ?

প্রফেসর হাত দিয়ে দৈর্ঘ-প্রস্থ বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, একটা বড় কথা।

মাখন বাওয়া ছটফট করে বলল, কি সেটা ?

প্রফেসর বলল, সুধীর বাবু ও শকুন্তলার বাগদান হয়ে গেছে। এ উপলক্ষে সর্দার ধনা সিং তার হোটেলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সে অনুষ্ঠানে নাচ-গানও হয়েছে।

মাখন বাওয়ার মনে হলো তার উপর পুনরায় আক্রমণ করা হয়েছে। চান্দাকে তার কবল থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আকস্মিক-ভাবে সে চিৎকার করে উঠলো, চিৎকার শুনে কুমুদিনী, লক্ষ্মী ও একটা নার্স ছুটে এলো। ওদের দেখে প্রফেসর বেরিয়ে গেলো। মাখন বাওয়া ওদের কাছে কিছুই বলল না।

মহল্লার অবস্থার পরিবর্তনের কোন আশা দেখা গেল না। মাখন বাওয়া দৈনিক খবর রাখতো। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তার যে কোন পাত্তাই থাকবে না এটাও বুঝতে পারলো. তার খুবই দুঃখ হলো। ভাড়ার টাকা ছাড়াও তার চলবে কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ফলান ছাড়া কি করে সে বেঁচে থাকবে? তাছাড়া তার আশংকা ছিল যে, সেদিন রাতের ঘটনা নিশ্চয়ই প্রফেসর সবাইকে বলে দিয়েছে। সুধীর এবং শকুন্তলার সাফল্যও ছিল তার চরম ব্যর্থতা, কারণ সে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে আসছিল এটা সবাই জানতো। কুমুদিনীর দিকে লক্ষ্মীর দিকে সে এমনভাবে তাকালো যেন তাদের শেষ বারের মত দেখছে আর কখনো দেখতে পাবে না। শক্ত লৌহ হাত থেকে সবই যেন পিছনে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, মন্দিরের প্রিয় কালো মূর্তি, নির্মিত সাদা সমাধিও হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে সে দারুণ অসহায় বোধ করলো। কুমুদিনী ও লক্ষ্মীকে করুণ স্বরে বললো, এখান থেকে ইয়াত্রা চলে যাব।

কুমুদিনী লক্ষ্মীর প্রতি লক্ষ্মী কুমুদিনীর প্রতি তাকালো। মাখন বাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা শুনে তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

প্রফেসর পীতাঞ্জলি হাসপাতাল থেকে সোজা পরীস্থান রেস্টুরেণ্ট গিয়ে পৌঁছালো। ধনা সিং ও প্রভাত তখন খোশগল্পে মেতে আছে। প্রফেসর তাদের বলল, হাসপাতালে গিয়েছিলাম। এখন চার তেষ্টা পেয়েছে।

মাখন বাওয়া এখন কেমন আছে? ধনা সিং উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল।

প্রফেসর উৎফুল্ল হয়ে বলল, কতকটা সুস্থ হয়ে গেছে, বেঁচে যাবে মনে হচ্ছিল কিছু এখন বাঁচার সম্ভাবনা কম।

কেন? কি হয়েছিল?

আমি বলে এসেছি যে, সুধীর বাবু প্রফেসর হয়ে গেছে।

প্রভাত বলল, তুমি কোন কথাই হজম করতে পারো না।

প্রফেসর হাত নেড়ে বলল, এ খবর শুনে সে ছটফটিয়ে উঠলো। আমি আরেকটা বোমা নিক্ষেপ করলাম। একেবারে বিরাট বোমা।

ধনা সিং টেবিলে হাত চাপড়ে বলল কি এমন বোমা মেরে এলে প্রফেসর ?

প্রফেসর বলল, আমি বলেছি যে সুধীর সাহায্য-সহযোগিতার সূত্র পেয়ে গেছে। শকুন্তলা ও শেঠজী সাহায্য করেছে। তাছাড়া সুধীর ও শকুন্তলার বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেছে। এ উপলক্ষে সরদার ধনা সিং-এর হোটেলে এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তারপর ? প্রভাত এবং ধনা সিং একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

প্রফেসর বলল, তারপর জখম খুলে গেছে, জ্বর বেড়ে গেছে, সে চিৎকার করে উঠেছে, আমি চলে এসেছি। মেয়েরা ছুটে এসেছে। ধনা সিং-এর কানে কানে প্রফেসর বলল, চা কিন্তু আসেনি, আজ বাড়ীতে চা খেতে চাচ্ছি না, পকেটে পয়সা আছে।

ধনা সিং হাসিমুখে বেয়ারারকে ডাকলো। চা এলে প্রফেসরকে বলল, এবার তুমি তোমার কথাকলিকে ঘরে তোলো। হীর-রান্‌ঝাকে ঘরে তুলেছে। সাচীপানের বড় লোভ হচ্ছে।

প্রফেসর সলজ্জভাবে হাসলো।

প্রভাত বললো, নিজের কথা উঠলে লজ্জা পাও কেন ?

প্রফেসর ধীরে ধীরে চায়ে চুমুখ দিতে দিতে বলল, এখন তোমাকে ভাল সূত্র ধরে দেব, আমি বড় হোটেলওয়ালা শেঠকে বলে রেখেছি। কাজ হয়ে যাবে।

ধনা সিং পাগড়ি ঠিক করে বলল, তুমি আগে নিজের পাগড়ি সামলাও তো, প্রভাতের পালাতো এসেই যাবে।

চায়ের শূন্য পেয়ালায় টোকা দিয়ে প্রফেসর বলল, সম্মেলন হবে নাকি ?

ধনা সিং বলল, এখন কিসের সম্মেলন হবে ? সবতো ঠিক হয়ে গেছে।

প্রফেসর বলল, আজ আমি একাই সম্মেলন করব।

কিছুক্ষণ পর প্রভাত চলে গেল। প্রভাতের শকুন্তলার সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। শকুন্তলার মামা একটা বিদেশী ফার্মের কর্মকর্তা। ইদানীং বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার যাওয়ার প্রস্তুতি

নিচ্ছেন। শকুন্তলা মামার সাথে দেখা করে প্রভাতের কথা উল্লেখ করলো। কয়েকটা আসন শূন্য ছিল কিন্তু প্রতিযোগিতা ছিল ভীষণ। শকুন্তলার মামার সুপারিসে একটা চাকরি হতে পারে কিন্তু তিনি এসব একদম পছন্দ করেন না। শকুন্তলা নাছোড়বান্দা, আজ তাদের বাসায় মামার নিমন্ত্রণ রয়েছে। এ সুযোগে সে মামাকে পাকড়াও করে কথা আদায় করে নেবে। ইন্টারভিউর আগেই শকুন্তলা প্রভাতকে তার মামার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এদিকে প্রভাত ছুটোছুটি করে হাল ছেড়ে বসে আছে। শকুন্তলার ইচ্ছে হলো প্রভাত কোন কাজ করুক। অমর সিং-এর একটা ভালো চাকরি হোক। কারণ প্রভাত ও অমর তার শুধু বন্ধুই নয়, সব ক্ষেত্রে সাহায্যকারী আপনজন। ওদের সাহায্য সহযোগিতার কারণেই সুধীর এতোদিন বেঁচেবর্তে ছিল বলা যায়। তাছাড়া ওদের কারণেই তার প্রেম গভীরতা পেয়েছিল। ওদের প্রচেষ্টায়ই সে নিজের প্রেম সার্থক করতে পেরেছে। এ জন্য এখন সে চায় সুধীরের বন্ধুদের পৃথিবীও স্বপ্নরঙীন হয়ে উঠুক।

প্রভাত হোটেল থেকে চলে যাওয়ার সময় ধনা সিং বলল, যাও যাও ;, মনে-প্রাণে তোমার সাফল্য কামনা করি।

উনিশ

প্রভাতের শেষ ভাগ্য পরীক্ষায় সফলতার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। তার ইন্টারভিউ ভালো হয়েছিল এবং শকুন্তলার মামা আশাতীত রকম সাহায্যও করেছেন। বিলেত যাওয়ার আগে তিনি শকুন্তলাকে জানিয়েছেন যে, ফার্মের কেন্দ্রীয় অফিসের পাঠানো তিন চারটি নামের মধ্যে প্রভাতের নাম প্রথমে রয়েছে।

প্রভাতের জন্য এটা ছিল এক উল্লেখযোগ্য সুসংবাদ। তাছাড়া আস্তাবল মহল্লায় তার সময় কাটছিল না। প্রায়ই সুধীরের কথা মনে পড়তো। জীবনের শুরু থেকে যেসব সমস্যা ও সংকট অতিক্রম করে সে অগ্রসর হচ্ছিল সবই তার মনে পড়ছিল। এ সময়ে পনের বিশ দিন পর সুধীর মাত্র একদিন তার সাথে দেখা করতে এসেছে। নতুন পরিবেশে নিজেকে সে ভালভাবে মাখিয়ে নিয়েছিল, সে পরিবেশে নায়কের মতো সে আবির্ভূত হলো। ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা করে সে মাকে নিয়ে আসার কথা ভাবছিল। তার একান্ত ইচ্ছে ছিল যে, প্রভাত এবং অমরও তার সাথে থাকুক। অমরকে একথা বলার পর সে বলেছিল, আমি অন্ধকারের কীট অন্ধকারেই বেঁচে থাকতে চাই। প্রভাত যদি যেতে চায় তবে তাকে নিয়ে যাও, আমার কোন আপত্তি নেই। সুধীর প্রভাতকে কিছু বলল না কারণ সে জানতো যে, প্রভাত অমরেরই প্রতিচ্ছায়া। অমরের প্রভাব তার উপর এতো গভীরভাবে পড়েছিল যে, তাকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা করে চেনার উপায় ছিল না।

আস্তাবল মহল্লা পরিচ্ছন্নতায় সুন্দর এবং আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নারী এবং শিশুদের মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। পুরুষদের চালচলনে অন্যরকম প্রত্যয় ও বলিষ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এক মাসের মধ্যেই সবাই মাখন বাওয়াকে ও তার ঘোড়াকে ভুলে গেছে। মাখন বাওয়ার সকল প্রাণবান ও নিষ্প্রাণ জিনিসকে ভুলে

গেছে। মন্দিরে আগের চেয়ে এখন লোক সমাগম বেশী হচ্ছে। কীর্তনও হচ্ছে যথারীতি। পূজার ঘণ্টা বাজছে, আলোও জ্বলছে শুধু মাখন বাওয়ার অনুচরদের কোথাও দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে উত্তরার কয়েকটি চিঠি এসেছে। কিন্তু প্রভাত একটিরও জবাব দেয়নি। এমনিতে সে উত্তরাকে আস্তাবল মহল্লার অবস্থা লিখে জানিয়েছিল। নিজের সঙ্গীদের থেকে শুরু করে প্রফেসর পীতাঞ্জলী পর্যন্ত সবার কথাই লিখে জানিয়েছিল কিন্তু তারপর দুমাস পর্যন্ত কার কি অবস্থা হয়েছে, তা আর লিখে জানায়নি। সুধীর ও শকুন্তলার ব্যাপার নিয়ে এ সময় তাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। উত্তরা সর্বশেষ চিঠিতে জানিয়েছিল যে, আনন্দের সাথে মালার বিয়ের আলোচনা ঢিলে হয়ে এসেছে, কারণ নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে ধরনের স্ত্রী তার প্রয়োজন মালার মধ্যে সেসব গুণ সে খুঁজে পায়নি। মালার পিতা চৌধুরী রতন সিং অনেক চেষ্টা করেছেন এবং আনন্দকে লাভ করার জন্য অনেক কিছু দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসছিল। প্রভাত আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল। জীবনে নতুন মোড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। সাফল্য খুব বেশী দূরে নয়। যেন হাতছানি দিচ্ছে। বিদেশে শকুন্তলার মতো সাহায্যকারিণী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। এখন মনে হয় সবাই যেন প্রভাতকে চেনে, সবাই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুধীরের সুরাহা হওয়ার পর নিজের ভাবিষ্যৎ সম্ভাবনার ঔজ্জ্বল্য দেখে প্রভাত উত্তরাকে একখানা চিঠি লিখেছে। চিঠিতে সে লিখেছে---কিছুটা বসন্তের রং কিছুটা জ্যোছনার আলো, গত কয়দিনে এদিকে অনেক কিছু হয়ে গেছে। অনেক ভাগ্য একসংগে খুলেছে। পরিবেশের পরিবর্তনে পুরনো জীবনের শিকড় উপড়ে গেছে এবং নিমেষে নতুন চারাগাছ জন্ম নিয়েছে। সুধীর ও শকুন্তলা সম্পর্কে তুমিতো জানোই ; শেষ চিঠিতে যে নৈরাশ্য প্রকাশ করছিলাম সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আসলে সুধীরের জীবনের ছক যেভাবে উল্টেছে তাতে আমি নিজের জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছি।

আগেই লিখেছিলাম যে মাখন বাওয়ার বিরোধিতা সুধীরকে কোন শুভ পরিণামে পৌঁছুতে দিচ্ছিল না। তার প্রভাব দেখে বুক কেঁপে উঠতো। তার ভক্তদের মধ্যে অনেকে ছিল বড়লোক, পুলিশের লোকেরা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। যে-কোন সময়ে

বিপদে জড়িয়ে দেওয়ার আশংকা ছিল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, রাতে ঘুমুতে পারতাম না। দিনের স্বস্তি পালিয়ে গিয়েছিল। কিছু ভাবতে পারছিলাম না লিখতেও পারছিলাম না, সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এ সময়ে এক অদ্ভুত ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলো।

আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না যে ঘটনা কি হয়েছে। এক রাতে কি যেন হয়ে গেছে, মাখন বাওয়া মারাত্মকভাবে আহত হলো। কে যেন তার মাথায় আঘাত করেছে কিন্তু ডাক্তারকে সে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার কথা বলেছে। এ ঘটনা সম্পর্কে প্রফেসর এবং চান্দা কিছু বলছে না। আমার ধারণা, মাখন বাওয়ার আছাড় খাওয়ার মধ্যে প্রফেসর এবং চান্দার হাত রয়েছে। এই আঘাতে আহত হবার পর দুর্বল অবস্থায় মাখন বাওয়া হাসপাতালে গিয়েছে। একমাস থেকে ওখানে রয়েছে। তার যাওয়ার পর মানুষরূপী একটা শয়তান থেকে মহল্লা মুক্ত হয়েছে। এলাকায় যে অশান্তি বিরাজ করছিল সেটা কেটে গেছে, একটা সাধারণ দুর্ঘটনা কয়েকটা অভাবনীয় সুন্দর ও রোমান্টিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।

প্রথম কথা হলো সুধীরের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। মাখন বাওয়াই ছিল তার পথের কাঁটা। প্রফেসরের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিটি লোকই মাখন বাওয়া বিরোধিতা করতো। এলাকার সবাই ছিল মাখন বাওয়ার বন্ধু, স্বজন। সে এক অদ্ভুত মানুষ। এ রকম বন্ধু বৎসল নিরহংকার মানুষ আমি দেখিনি। তবু সবাই মাখন বাওয়াকে ভয় করতো। সেই লোকটি সাময়িকভাবে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সুধীর ও শকুন্তলার বিয়ের ব্যাপারে শকুন্তলার পিতা রাজি হলেন। সুধীর এখন একটি বিখ্যাত কলেজে অধ্যাপনা করছে। শেঠজীর সুপারিশে তার চাকরি হয়েছে। আসল কথা হলো, সুধীর ও শকুন্তলার বাগদান হয়ে গেছে। এটা তোমার জন্য নিঃসন্দেহে একটা সুসংবাদ, তোমার চেহারা আনন্দে চিকচিক করে উঠবে। আমারই এক হতভাগ্য সাথীর ভাগ্য খুলেছে, সে নিজের স্বপ্নরাজ্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। আমি খুবই খুশী হয়েছি, জীবনের তিক্ততা ভুলে গেছি। ভবিষ্যতে নিজের প্রসন্ন ভাগ্য সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠছি। আমার মতো লোকের জন্য-এইই যথেষ্ট।

সুধীর এখন তার মাকে কাছে নিয়ে আসতে চায়। তিনশ টাকা মাসিক বেতনে সে পছন্দনীয় চাকরি করছে। শীঘ্রই একটা ছোট

বাসা নিয়ে নিজ জীবনের ফুল বাগান রচনা করবে। আস্তাবল মহল্লার যে বর্ণনা তোমাকে আগে লিখেছিলাম বহুলাংশে তার পরিবর্তন হয়েছে। চার দিকে এখন পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বল আলোর সমুদ্র দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

প্রফেসর পীতাঞ্জলি এখন খুবই খুশী। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এরকম মানুষ পাওয়া যাবে না। তার মনে কি আছে, সে কি চায়? সেটা কেউ জানে না। তার জীবনে চান্দা আসার পর সে অনেক সংযত হয়ে গেছে। পেটের চিন্তা তার কখনোই বড় একটা ছিল না। কিন্তু চান্দার জন্য সে একটা হোটেলে কাজ করছে। সে কাজ তার পছন্দ নয় কিন্তু চান্দার জীবন তার খুবই পছন্দ। নিজের জীবন নিজের আকাঙ্ক্ষিত পেশার চেয়ে অধিক প্রিয়। চান্দার জন্যই এখন প্রফেসর বেঁচে আছে, চান্দা সম্পূর্ণ ভাল---সুস্থ হয়ে গেছে। তার চেহারার অপরূপ লাবণ্য ফিরে এসেছে। মাঠের হরিৎ আভার মতো চোখের চাহনি। সারা দেহে ভরা যৌবন। তার মনের অবস্থা আমার জানা নেই, তবু এটা জানি যে, প্রফেসরকে সে খুব একটা পছন্দ করে না তবে প্রফেসরের দ্বারা সে খুবই প্রভাবিত। সুধীর কোন এক চিত্র নায়কের মতো বলতো, আজকালকার মেয়েরা প্রথমে প্রভাবিত হয় পরে কিছু কিছু পছন্দ করে। তারপর ভাল লাগে, ---লেগে এবং পেতে চায়। তারপর এমনও সময় আসে যখন মনে হয় যে কিছু একটা হয়ে গেছে। ওঠা বসা চলাফেরা ঘুরাফিরা কথাবার্তায় একটা কিছু হয়ে যায়---যার নাম ভালবাসা। সুধীরের সম্পর্কে আমি তোমাকে লিখেছিলাম যে, তার চেহারা আছে কিন্তু মাথায় বুদ্ধি নেই। এখন লিখছি যে, ভাল চেহারার সাথে ভাল বুদ্ধিও তার রয়েছে। জীবনের সকল জটিলতা সহজে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আর প্রফেসর সম্পর্কে বলতে হচ্ছে যে, তার ব্যক্তিত্বে চান্দা প্রভাবিত, সে প্রফেসরকে কিছু কিছু পছন্দও করছে। একদিন তার চোখের দিকে তাকিয়ে একথা জিজ্ঞেস করায় সে সলজ্জভাবে হাসলো। প্রফেসর তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে এবং তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। খুবই আঘাতপ্রবণ, আমার তো আশংকা হচ্ছে যে কবে না জানি নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষারই ত্যাগ স্বীকার করে বসে। আমি কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে আশাবাদী। আমি সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি যেদিন তাদের একত্রে বসে থাকতে হেসে খেলে ঘুরে

বেড়াতে দেখবো। চান্দা হলো প্রফেসরের কথা কলি আর প্রফেসর তো কথাকলির জন্য উৎসর্গিত।

আমার ভাগ্যের পর্দা উন্মোচিত হতে চলেছে, এটা তোমার জন্য নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। হয়ত জীবন শেষবারের মত মোচড় নিচ্ছে। এবার কিছু একটা হবে বলে মনে হচ্ছে। শকুন্তলার মামা একটা বিদেশী ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। সেখানে কয়েকটা আসন খালি রয়েছে। সেদিন জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি। আশা করি শীঘ্রই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় অফিসে যেসব নাম পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে তোমাদের প্রভাতের নাম সর্বাগ্রে রয়েছে। তুমি, মালা, আনন্দ, মা, ভগ্নী সবাই আমাকে সহযোগিতা করেছো। কাকে রেখে কাকে ধন্যবাদ জানাবো? চারশ টাকায় চাকরি হয়ে যাচ্ছে, উপার্জনক্ষম হয়ে তোমার কাছে আসব তুমি আমার জীবনাকাশে ধ্রুবতারার মতো পথের দিশারী। কখনো আমাকে পথভ্রান্ত হতে দাওনি। এবার এসে মা ও মালাকে নিয়ে আসব। একজন আমাকে পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য অন্যজন বসন্তের সুবাস দিয়েছে। মালাকে বলবে যে, জীবনের কঠিন অন্ধকার কেটে গেছে এখন শুধু বাসন্তী ফুলের সমারোহ থাকবে। স্থায়ী বসন্তের গীতিমাল্য এবং অনিঃশোধিত চাঁদের আলোর বিকিরণ ঘটবে।

মাকে অবশ্য আলাদা চিঠি লিখছি। তাকে এবং তোমার মাকে জানাবে যে, প্রভাত তাদের মমতাময় আশীর্বাদে জীবনের আনন্দঘন দিনের কাছাকাছি পেঁৗছে গেছে। আর কি লিখব বলো। এ চিঠি তোমার হাতে পেঁৗছানো পর্যন্ত হয়তো আমি লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছে গেছি এবং একটা সুদৃশ্য বাড়ীতে নিজের স্থান করে নিয়েছি। এখন প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্ভাবনায় কেটে যাচ্ছে।

অমর জীবনকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে দেখছে। অনেক বড় বড় দুর্ঘটনাও তার জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ঊর্মিলা এখন আর চিঠি লেখে না। অমর ঠিকই বলেছিল যে, একদিন এ চিঠির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি নতুন ঠিকানা থেকে ঊর্মিলাকে চিঠি লিখব স্বাভাবিকভাবেই জবাব পাব না। ঊর্মিলা সম্ভবত ঘর সংসার সাজিয়েছে, কিন্তু এতে অমরের জীবনে কোন ছেদ পড়েনি। শূন্যতারও সৃষ্টি হয়নি।

মালাকে তুমি এমন জোরে কাতুকুতু দেবে যেন সে আমার যাওয়া পর্যন্ত হাসতে থাকে। যখনই মালাকে স্বপ্নে দেখেছি কাঁদতে দেখেছি। দেখেছি তার চোখে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু। কিন্তু স্বপ্নতো উল্টো হয়। স্বপ্নে ক্রন্দসী মালাকে বাস্তবে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পাবো, কেমন তাই না?

চিঠি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। এ চিঠিতে তোমার তিনটে চিঠির এবং আমার কাছে লেখা গীতিগুচ্ছের জবাব রয়েছে। এ চিঠিতে আমার স্বপ্নের বাস্তবতা, আমার সফলতা দেখে তুমি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। তুমি তো কান্না ছেড়ে দিয়েছ, কিন্তু এ চিঠি পাওয়ার পর নিজের অজ্ঞাতেই তোমার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আসবে। তোমার সে অশ্রু হবে আনন্দের, পরিতৃপ্তির।

তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি না থাকলে ভাগ্য আমাকে কোথায় পেঁাছে দিতো আমি জানি না।

মালার জন্য কিছুই লিখলাম না, কারণ আমি তার সামনে বসে মুখোমুখি কথা চলতে চাই।

উত্তরার জন্য লেখা---

প্রভাতের চিঠি।

চিঠি লেখার পর প্রভাত তিন চার বার পড়লো, চুমু খেলো, চোখে ছোঁয়ালো তারপর নিজের স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেলো।

বিশ

অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্ন মহল্লায় পরিচ্ছন্নতার পরশ লাগলো, চারদিকে যেন আলোর বান ডেকে গেলো। নিষ্প্রভ সৌন্দর্যহীন মহল্লা সৌন্দর্যে শোভায় ভরে উঠলো। সুধীর ও শকুন্তলার ব্যর্থতার কাছাকাছি পেঁৗছে যাওয়া প্রেম অকস্মাৎ সাফল্যের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রফেসরের রঙ্গ রস পূর্ণ আলোচনা খুশির বন্যা বইয়ে দিলো। কিন্তু সফলতার প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাবার পর হঠাৎ যেন সব ঝিমিয়ে পড়লো, মাখন বাওয়ার হাসপাতালে যাওয়ার পর কিছুদিন ধরে জমজমাট আলোচনার তুফান ছুটিয়ে সবাই যেন নিজেকে গুটিয়ে নিল। কেউ কারো সাথে বড় একটা মেলামেশা করে না, দূরে থেকে তাকিয়ে হাসে, ভাবখানা এই যে, ময়দান আমাদেরই করায়ত্ত এখন আর কি বলার বা করার থাকতে পারে।

কয়েকদিন থেকে প্রভাত কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে, আগে প্রভাতের সঙ্গে দেখা করার জন্য যে করেই হোক সে সময় করে নিতো, এখন কয়দিন থেকে তার সঙ্গেও দেখা নেই। তার কাম্রায় কয়দিন ধরে আলো জ্বলেনি। কোথায় কোন হোটেলে কাজ করে সেটাও কাউকে জানায়নি। কতো হোটেল রয়েছে, তাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রভাত চান্দাকে জিজ্ঞেস করলো কিন্তু চান্দাও চিন্তিত হয়ে পড়েছে, প্রফেসর তার সাথেও দেখা করছে না।

ধনা সিং-এর সাথে প্রফেসর প্রতিদিন দেখা করতো কিন্তু তাও এখন ছেড়ে দিয়েছে। ধনা সিং-এর জুয়ার আডডা থেকে কয়েকজন জুয়াড়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধনা সিং গ্রেফতার হলেও পরে ছাড়া পেয়ে গেছে, তবে তার আডডা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ধনা সিং-এর রঙ্গরস হাসি কৌতুক সব যেন জুয়ার আডডা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। সোনার চিড়িয়া বলে পরিচিত তার তিনটি রক্ষিতার দুটি উড়ে গেছে, তৃতীয়টিও উড়ি উড়ি করছে।

অমর সিং অনেক রাতে ঘরে ফিরে এদিক সেদিকের কথা বলে শুয়ে পড়তো এবং ভোরে উঠে বেরিয়ে যেতো। বর্তমানের মতো একাকীত্বের বেদনা প্রভাতকে কখনো পেয়ে বসেনি। চাকরির কাগজপত্র কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এখনো আসেনি।

একরাতে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে অমর সিং বলল, তাকে তার মামা ডেকে পাঠিয়েছে। সম্ভবত বিয়ের কথা বলবে। অমর বিয়ের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছিল কিন্তু তার মামা বিশেষভাবে দেখা করতে বলেছে, প্রভাতও তাকে পরামর্শ দিয়েছে যেন দেখা করা দরকার। পিতার অবর্তমানে মামাই অমরের অভিভাবক।

সুধীর নাকি বাসা ভাড়া করে তার মাকে আনতে গেছে। তার বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে প্রভাতকে বহুবার শকুন্তলাদের বাড়ী যেতে হয়েছে, অমরকেও নানা মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধনা সিং এবং প্রফেসরও যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে। অথচ তারিখ ধার্যের ব্যাপারে কারো সাথেই পরামর্শ করা হয়নি। এদের কিছু জানানোও হয়নি। ধনা সিং-এর সাথে দুবার দেখা হওয়ার পর জানা গেল অমর ও প্রভাতের মহল্লা না ছাড়ার কারণে সুধীর এদের উপর অসন্তুষ্ট।

সুধীরের কথা উঠলে অমর কোন আগ্রহ প্রকাশ করতো না। যেন সে লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছে গেছে, তার প্রতি আগ্রহী হয়ে আর কি লাভ— এখন শুধু প্রভাতের ব্যাপারেই অমর উৎসাহী ও আগ্রহী। প্রভাতের চাকরির ব্যাপারেও অমর প্রভাতের মতোই উদগ্রীব।

রাত গভীর হলেও অমর ও প্রভাত মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। হঠাৎ চটের পর্দায় উঁকি দিয়ে প্রফেসর পীতাঞ্জলি বললো, এখনো জেগে আছো ?

অমর চুপ করে রইল। প্রভাত বলল আমি আরো ভেবেছি তুমি মহল্লা ছেড়ে দিয়েছ।

প্রফেসরকে উদাসীন মনে হচ্ছিল। আজ সে অনেক মদ খেয়েছে। মদ খাওয়ার পর তার চোখদুটি সুন্দর হয়ে ওঠে, কিন্তু আজ সে দুটি চোখেও কেমন এক বিষন্নতার ছাপ লেগে আছে। মনে হয় যেন কয়েকদিন ধরে সে ক্রমাগত কেঁদেছে। প্রভাতের কথার জবাবে প্রফেসর বলল, তোমার এরকম মনে হলো কেন?

প্রভাত সঙ্গে সঙ্গে বলল, দুসপ্তাহ পরে আজ তোমাকে দেখলাম, আমাদের সঙ্গে দেখা না করলেও চান্দার সঙ্গে তো দেখা করবে। কয়েকদিন থেকে সে তোমার মুখ চেয়ে আছে।

প্রফেসর অমরকে বললো তুমি ভাল আছো ?

অমর হাসলো। প্রফেসর বললো, তুমি দেখি আজব লোক হে! দেখাই পাওয়া যায় না। এদিকে এতো কিছু হলো আর তুমি কিনা লাপাত্তা।

অমর হেসে বলল, লাপাত্তা আমি না তুমি! আর আমি সব কিছু দেখছি শুনছি এবং আশীর্বাদ করছি।

---কি আশীর্বাদ।

---তোমরা সবাই যেন সফলতা লাভ করতে পারো।

প্রফেসর চুপ করে রইলো। তার সাথে একটা এটাচী কেস। অমর জিজ্ঞেস করল নতুন কিনলে নাকি ?

প্রফেসর ঘাড় নাড়লো।

অমর বলল খালি না ভর্তি ?

একদম ভর্তি। প্রফেসর এটাচী খুললো। দেখা গেল তাতে জামা কাপড়ে ভরা। বলল, চান্দার জন্য এনেছি।

তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে ? প্রভাত জিজ্ঞেস করলো।

---ওদিকেই ছিলাম, এদিকে আসিনি। ওদিকেই ঘুমিয়েছি। তোমার চাকরি হলো ?

---এখনো হয়নি।

---হবে ?

---আশা তো করছি।

প্রফেসর একটুখানি হেসে বলল, ভালো। ভালোই হবে। ভাল লোকদের ভাগ্য একদিনে খুলে যায়। অমরের দিকে হঠাৎ তাকিয়ে বলল, একদিন তোমার ভাগ্যও হঠাৎ খুলে যাবে।

বড় লোক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য দেখতে পাব না মনের কথা মনেই থাকবে।

অমর বলল, সবকিছু তোমার সামনে হচ্ছে। সুধীর বড়লোক হয়ে গেল, তুমি দেখেছ এখন প্রভাতের পালা। তারপর আমার পালা, তখন তুমি সবাইকে দেখবে।

প্রফেসর জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, আমি দেখব না। আমি শুনে খুশী হব যে, আমারই লোক বড় লোক হয়েছে।

প্রভাত অমরের দিকে তাকালো। প্রফেসর মন-মেজাজ অনু-যায়ী কথা বলছিল না। সে মাখন বাওয়াকে গালি দিল না। সর্দার ধনা সিংকেও কিছু বলল না। হাসি-ব্যঙ্গাত্মক কোন কথাও বলল না। তার চেহারা উদাসীন, চুল আগোছালো। ফোলা ফোলা চোখ। এমনভাবে সে তাকাচ্ছে যেন সবকিছু শেষ বারের মতো দেখছে। কথায় কথায় বসে পড়ে প্রফেসর একটা মোমবাতি বের করে বলল, এটা জ্বালাও।

কেন ? উভয়ে একত্রে জিজ্ঞেস করলো।

আলো একেবারে কম, তোমাদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।

যে মোমবাতি জ্বলছিল তাদের ছোট কামরায় আলোর জন্য সেইই যথেষ্ট, তবুও প্রফেসরের কথা রক্ষার জন্য প্রভাত তার হাত থেকে নিয়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করলো।

দ্বিতীয় মোম জ্বালানোর পর প্রফেসর পকেট থেকে একটা বোতল বের করে ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিল।

অমর মৃদু ধমক দিয়ে বলল, এতো পান করা ভালো নয়।

জামার কোণে মুখ মুছে প্রফেসর বলল, আজকাল কখনো সখনো পান করি, আর তখন একেবারে পেট ভরে পান করতে হয়। কয়েক দিন পর আজ করলাম।

অমর অনেক দিন পর প্রফেসরের সাক্ষাৎ পেয়েছে। তার সাথে মন খুলে কথা বলতে চায়। প্রফেসরকে অতীতের কাহিনী, কথাকলির আলোচনা, চান্দার অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলো। এসব আলোচনায় প্রফেসর হেসে কুটি কুটি হতো কিন্তু আজ অনেক চেষ্টার পরও তার মুখে হাসি দেখা গেল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর অমর মাখন বাওয়ার প্রসঙ্গ তুললো। হাসতে হাসতে সে প্রসঙ্গে নানা কথা বললো। কিন্তু প্রফেসরের চোখে মুখে কোন পরি-বর্তন দেখা গেল না।

প্রফেসর কেমন বোকা বোকা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ উচ্চস্বরে বলল, প্রভাত বাবু এই এটাচী কেস থাকলো, এতে জামা কাপড় রয়েছে এটা চান্দাকে পৌঁছে দিও।

প্রভাত বলল, তোমার কি হয়েছে ? সকালেতো নিজেই পৌঁছে দিতে পারো।

প্রফেসর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমার কথা রাখতে হবে, তোমাকে যেতে হবে।

প্রভাত বলল, কেন চান্দার সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

প্রফেসরের উদাস গম্ভীর চেহারায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। মোমবাতি যেমন নিভে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনিভাবে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে সে ঘাড় নেড়ে বোঝালো যে ঝগড়া হয়নি। মুখে বলল, ওকে আমি বললাম, চান্দা তুমি এখন ভাল হয়েছো, তুমি মুক্ত, বল কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে? সে কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েদের নিয়ে বিপদ এই হাসে, এই কাঁদে। আমি বললাম, কাঁদছ কেন, বল কোথায় যাবে? সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, আমি বিলিয়ার কাছে যাবো, ওর সাথে গ্রামে চলে যাবো।

প্রফেসর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, এ এটাচী কেসটা তাকে দেবে ; এখানে টাকা আছে অনেক টাকা। কতো হবে তা আমি গুণে দেখিনি। এ টাকা ওকে দেবে এবং ওর নিজের লোকের মধ্যে ওকে রেখে আসবে।

একটা ছেঁড়া পুরণো খামে টাকা রেখে প্রফেসর প্রভাতের দিকে এগিয়ে দিল, এটাচীও এগিয়ে দিল। তারপর বাইরে জমাট আঁধারের দিকে তাকিয়ে বলল, মেয়ে মানুষ তার মনের কথা বলে ভালোই করেছে। ভালোই হয়েছে, তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। নিজের লোকদের কাছে যাবে, থাকবে, বাঁচবে তারপর মরে যাবে। না না মরবে না। আমি মন থেকে কামনা করি সে মরবে না। মনের কোন কামনা কোনদিন পূর্ণ হয়নি কিন্তু এখন পূর্ণ হবে। আমি খুশী হয়েছি। আমার কথাকলি আমি পেয়ে গেছি। চান্দা ভাল মেয়ে ছিল, ভাল বধূ হবে। সংসার সাজাবে। গ্রামের মানুষ গ্রামে গিয়ে প্রেম করবে, বেঁচে থাকবে, ভালই হবে।

প্রফেসরের কথা শুনে অমর থ বনে গেল। প্রভাত অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছিল তবু তার দু'চোখের পাতা ভিজে গেল। তার মন ভরা কান্না, মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে, প্রফেসরের আনন্দ তার নিজেরই আনন্দ ছিল।

অনেক কষ্টে প্রফেসর অতীতের বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকে একত্রিত করলো, সে স্মৃতি দিয়ে সে নতুন জীবনের কণ্ঠহার তৈরী করবে। ভাগ্যের নির্মম হাত তার স্বপ্ন সাধকে ভেঙে চুরমার করে দিলো। দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা নিমেষে কুয়াশা বিন্দুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে মিশে গেলো।

পুরানো মোমবাতি টিম টিম করে জ্বলে এক সময়ে নিভে গেলো।

নতুন মোমবাতিটা নীরবে জ্বলতে লাগলো।

প্রফেসর কান্নাভরা চোখে মোমবাতির শিখার প্রতি তাকালো, সে আলোয় নিজের নির্বাপিত ধারণাকে আলোকিত করার শেষ চেষ্টা করলো কিন্তু সম্ভব হলো না। হাত জোড় করে তখন বন্ধুদের বললে, আমি শহরে যাওয়ার টিকেট নিয়ে এসেছি। ওদিকেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কথাকলিকে কনের মতো সাজাবে, সকালে যাওয়ার পর এদিকে আর আসব না। আমার যাওয়ার ব্যাপারে চান্দাকে কিছু জানাবে না বুঝলে প্রভাত ? তাহলে সে তার মনের কামনা বাসনা পরিত্যাগ করবে। আমি তাকে জানি এবং বুঝি। সে খুব ভালো মেয়ে। সূর্যোদয়ের আগেই তাকে নদী-তীরের সেতুর কাছে রেল কলোনীতে রেখে আসবে। সেখানে শ্রমিক-দের সাথে তার নিজের লোক বাস করে। প্রফেসর পীতাঞ্জলি মরে গেলেও তোমাদেরকে মনে রাখবে---ভুলবে না। তোমরা এখন ঘুমাও আমি জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছি। তোমাদের আমার সঙ্গে আসতে হবে না। একদিন তোমরা বড় লোক হবে, তখন প্রফেসর পীতাঞ্জলিকে স্মরণে আমি খুশী হবো। তোমাদের সাথে তখন অবশ্যই দেখা করবো।

হাত তুলে বিদায় জানিয়ে প্রফেসর আঁধারের সাথে মিশে গেল। প্রভাতের চোখের চেপে রাখা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অমর অন্য মনস্কতার ভান করে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

প্রভাত দেখলো আজো প্রফেসরের কামরায় ঘুটঘুটে অন্ধকার সেখানে কেউ আলো জ্বালেনি।

একুশ

এক সপ্তাহ ধরে প্রফেসর পীতাঞ্জলির কামরা শন্য পড়ে আছে। এর মধ্যে কেউ একটু উঁকি দিয়েও দেখেনি যে প্রফেসর আছে কিনা। তবে প্রফেসরের কামরা পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রত্যেক পথচারীদের মধ্যে প্রফেসর পীতাঞ্জলিকে খুঁজে বেড়িয়েছে। আজব লোকদের আজব মহল্লা, সেখানে কারো যাওয়া আসার খবর কেউ রাখে না। সেখানে সবাই আপন, সবাই পর। ঝড়ের-বৃষ্টির পূর্বাভাস দেখা দিলে সবাই একত্রিত হয় আবার সে আশংকা কেটে গেলে যার যার মত আলাদা হয়ে পড়ে। তখন আর কেউ কাউকে চেনে না। প্রফেসর সবার হয়েও কারো ছিল না আবার কারো না হয়েও ছিল সকলের। একমাত্র প্রভাত ছাড়া অন্য কেউই প্রফেসরের অনুপস্থিতি অনুভব করেনি। প্রভাত প্রফেসরের বিদায়ে অশ্রুপাত করেছে। ভর সন্ধ্যায় তার কামরায় আলো জ্বালিয়ে তক্তপোষের নীচে রেখে এসেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষণ্ণ মনে বসে বসে প্রফেসরের স্মৃতি রোমন্থন করেছে। অমর প্রফেসরের পরিত্যক্ত কামরায় কখনো প্রবেশ করেনি তবে কামরার সামনে অনেক সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

কয়েক সপ্তাহ হলো চান্দা চলে গেছে। প্রেমিকের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তার আনন্দের সীমা নেই, যেন তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তার আত্মা, হাসি সবই সেখানে পড়েছিল। নিজের দেহ নিয়ে শুধু সে পালিয়ে গিয়েছিল। তার একটা দুঃখ ছিল যে প্রফেসর তাকে রেখে আসেনি। প্রফেসর কি অবস্থায় ছিল, কিভাবে তার দিন কাটছিল চান্দা সেটা জানত না। প্রফেসরের মত মানুষ যে একটা যুবতী মেয়েকে ভালবাসার মতো মনের অধিকারী হতে পারে এটা সে ভাবতেই পারেনি। কারণ তার ধ্যান-ধারণা গ্রাম এবং গ্রামের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রফেসর যদি নিজের অবস্থা চান্দাকে খুলে বলতো, মনের ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতো তাহলে

সবকিছু ছেড়ে প্রফেসরকেই আপন করে নিতো। প্রফেসর ঠিকই বলেছিল যে, চান্দা তার মনের কথা সর্বাগ্রে প্রকাশ করেছে, কিন্তু প্রফেসর নিজে কিছুই বলেনি বললে চান্দা তাকে আপন করে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হতো না, শৈশব থেকে চলে আশা প্রেমের নতুন উন্মেষ হতে দিতো না। কিন্তু প্রফেসর কিছুই বলেনি, চান্দা কিছুই বুঝতে পারেনি। তার দৃষ্টিতে প্রফেসর ছিল একজন দেবদূতের মতো, দেবদূতেরা তো কিছু পেতে চায় না শুধু অন্যের ঝুলি ভরপুর করে দেয় আনন্দে।

প্রফেসরের চলে যাওয়ার পর মখিয়ার ঘরে গিয়ে চান্দার সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাকে তার আপনজনের কাছে পেঁৗছে দেয়া প্রভাতের জন্য ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রভাত তাকে কি বলবে এবং কিভাবে বলবে কিছুই ভাবতে পারছিল না। সে অদ্ভুত এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল মহল্লা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে চান্দা হয়ত অঝোর ধারায় কাঁদবে। প্রফেসরকে না দেখে হয়তো যেতেই চাইবে না। তাহলে একটা নতুন ঝামেলা দেখা দেবে। কিন্তু প্রভাতের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো, চান্দা যেন এ সময়েরই প্রতীক্ষায় ছিল। তার চোখ খুশিতে চিকচিক করে উঠলো। আস্তাবল মহল্লার জীবন যেন ছিল তার জন্য একটা স্বপ্ন,---দীর্ঘতর স্বপ্নে সে প্রফেসর,ও মখিয়া নামে দুজন দেবদূতকে পেয়েছে। মাখন বাওয়া নামে একটা শয়তানরূপী মানুষেরও সাক্ষাৎ পেয়েছে। চান্দা ছিল পীর পাঞ্চালের বরফ দেশের পরী, সে পরীর জন্য দুই দেবদূত ও একটা শয়তানের মধ্যে লড়াই হয়েছে, সে লড়াইএ শয়তান পরাজিত হয়েছে দেবদূতের জয় হয়েছে। তারপরই স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

প্রফেসর সম্পর্কে চান্দা শুধু এটুকু জিজ্ঞেস করেছে যে, প্রফেসর নিজে এলেন না যে! প্রভাত এ প্রশ্নের একটা মনগড়া জবাব দিয়েছে, চান্দা সে জবাবেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। প্রভাত জিজ্ঞেস করেছিল এখানে কারো সাথে দেখা করবে? চান্দা হেসে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল যে সে কারো সাথে দেখা করবে না। সেখানে তার কেউ নেই কার সাথে আর দেখা করবে, এটাই সে বুঝিয়েছিল।

সকাল বেলা চান্দাকে নিয়ে প্রভাত নদীতীরের সেতু সংলগ্ন শ্রমিক কলোনীতে পেঁৗছার পর চান্দাকে দেখেই বিলিয়া ছুটে এসেছিল। অন্যান্য শ্রমিক মজুররাও যেন চান্দার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল।

প্রভাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখল শৈশবের দুটি সাথী, গ্রামের ছোট দুটুকরো জমি পরস্পরের সাথে মিশে গেছে। বয়েসের ব্যবধান, সামাজিকতা কিছুই তাদের আবেগকে রুদ্ধ করতে পারেনি। লজ্জা সংকোচ নিমেষে পালিয়ে গেছে। রাত্রি শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম সূর্যালোকে রাতের স্বপ্ন মুছে গেছে। এখন আর কিছু মনে নেই। কোথা থেকে এসেছে, কে এসেছে কিভাবে এসেছে, যেন কিছুই সে জানে না।

অমর শুনে খুশী হয়েছিল। চান্দার মধ্যে সে এমন মেয়ের রূপ দর্শন করেছিল যে কিনা ভালবাসার জন্য আত্মহত্যা করে না, যে যার তার সাথে ভালবাসা করে না, যে কিনা শৈশবের ভালবাসাকেই শুধু বুকে চেপে রাখে। বয়স, পরিবেশ পরিস্থিতিতে যার ভালবাসা এতটুকু ম্লান হয় না।

একদিন সকালে শকুন্তলা এলো এবং প্রভাতকে গাড়ীতে বসিয়ে তার মামার অফিসে নিয়ে গেল। প্রভাত সেখানে চাকরির নিয়োগ-পত্র পেলো। শকুন্তলা খুব খুশী হলো। মাখন বাওয়া নতুন কোন গদীর লোভে ইয়াত্রায় চলে গেছে। তার ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। শকুন্তলার পথ ছিল এখন কণ্টকমুক্ত। প্রভাতের চাকরির ব্যাপারে সে চিন্তিত ছিল; সে চাকরিও হয়ে গেছে। মাসিক বেতন চারশ টাকা আর থাকার জন্য একটা ছোট বাড়ী। সেদিনই প্রভাত কাজে যোগদান করল। তার জন্য নির্ধারিত বাড়ী একবার বাইরে থেকে দেখলো, ভেতরে প্রবেশ করল না। এ সময়ে শকুন্তলা এবং সুধীরও তার সাথে ছিল। বাড়ীর লনে ফুলের ঝাড় এবং ছোট ছোট গাছ দেখে তার শৈশবে দেখা ইউক্যালিপটাস গাছের কথা মনে পড়লো। আজ সে ভেবে পাচ্ছিল না যে এতবড় সুসংবাদ সে কাকে শোনাবে। কার কাছে কানে কানে বলবে যে, দেখো আমি আমার আকাঙ্ক্ষার জগতে পেঁছে গেছি। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তার অমরের কথা মনে পড়লো। অমর তার মামার সাথে তিন দিন হলো দেখা করতে গেছে। প্রভাত ভাবলো, আজ যদি অমর এসে পড়তো তাহলে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে বলতো, তোমার নয়া জগতে এসে যাও। সে জগৎ তোমারই পথ চেয়ে আছে। কিন্তু অমর এখন তার কাছে নেই। সুধীর ও শকুন্তলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন বাড়ীতে ওঠার জন্য সুধীর এরং শকুন্তলা প্রভাতকে অনেক অনুরোধ করলো, তারা বললো যে, অমরকে পরে নিয়ে আসবে। কিন্তু

প্রভাত একই সাথে অমরকে নিয়ে সে বাড়ীতে উঠতে চাচ্ছিল। তার হাতে ঘরের দরজা খোলাতে চাচ্ছিল। অমরকে সুসংবাদ শোনা-নোর পর প্রভাত মায়ের কাছে উত্তরার কাছে মালার কাছে চৌধুরী রতন সিং-এর কাছে এবং আনন্দের কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখবে। চিঠির বক্তব্য সে মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিল। এসব চিঠি সে নতুন বাড়ীতে বসে লিখবে।

নতুন চাকরির কারণে প্রভাত খুব স-গলে অফিসে চলে যেতো এবং বিকেলে নাগাদ ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতো। এর মধ্যে সে নতুন বাড়ীর ধারে কাছে আর যায়নি এবং কাউকে চিঠিও লেখেনি। তিনদিন থেকে অফিস করেও প্রভাতের মনে হলো তার চাকরিই হয়নি এবং উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।

অমর না থাকলে কোন কিছুই উল্লেখ করার মতো থাকে না।

বিকেল হয়ে গেছে। অফিসের সবাই নিজ নিজ বাসায় চলে গেছে। প্রভাত সেদিনও অমরের প্রতীক্ষায় কাটালো। রাতে সে সুধীরের কাছে গিয়ে থাকতো, দিনের বেলায় অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে কাটাতো। কিন্তু সময় যেন তার কাটতে চায় না। সেদিন অফিস থেকে অমরের অফিসে টেলিফোন করে প্রভাত খবর পেলো যে, অমর ফেরেনি। বিকেলের দিকে বেয়ারারা বললো, স্যার একজন সাহেব দেখা করতে চান। প্রভাত সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে দেখলো অমর দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত দৌড়ে গিয়ে অমরকে জড়িয়ে ধরে বলল, কখন এলে? অমর বলল, দুপুরে এসেছি, অফিসে তোমার অপেক্ষা করে এদিকে চলে আসলাম।

প্রভাত বলল, চাকরির সাথে সাথে থাকার জন্য একটা বাসাও পেয়ে গেছি।

অমর বলল, আমি সরদার ধনা সিং-এর কাছে সব শুনেছি। কিন্তু তুমি ওখানে উঠলে না কেন?

তোমাকে ছাড়া নতুন বাসায় উঠি কি করে? আজ তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে যে, আমি চাকরি পেয়েছি এবং থাকার জন্য একটা বাসাও পেয়েছি।

উত্তরাকে জানিয়েছ?

এখনো জানাইনি। তুমি এসেছ এজন্য আজই নতুন বাড়ীতে যাব। সেখানে বসে সবাইকে চিঠি লিখব। শুধু তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম।

আজই যাও, আমি খুশী হয়েছি। খুব খুশী হয়েছি।

কেন তুমি যাবে না?

অমর ঘাড় নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করলো।

প্রভাত বলল, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, না হলে সেখানে যাবই না।

অমর বলল, পাগলামি করো না, তুমি যাও, একদিন আমিও যাব। এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আমি আপাতত আস্তাবল মহল্লা ছাড়তে পারব না।

প্রভাত জানতো অমরের মুখের হাঁ না-তে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব নয়। সে উদাসভাবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার সাথে এখন আসো, নতুন বাড়ীটা অন্তত দেখে যাও।

অমর বলল, তোমার জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে আছে এখন চল।

আর তুমি?

চৌরাস্তা পর্যন্ত তোমার সাথে যাব, তার পর অফিসে যাব। একটা ইণ্টারভিউর চিঠির প্রতীক্ষায় আছি। তোমার নতুন বাসার ঠিকানাটা লিখে দাও তো!

প্রভাত কাগজে নতুন বাসার ঠিকানাটা লিখে দিল। অমর সেটা পকেটে রাখলো। তারপর দু'জনেই' ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাক্সী চৌরাস্তায় এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে অমরের নামবার সময় প্রভাত ঝুঁকে অমরের পা ছুঁয়ে প্রণাম জানালো। যেন ছোট ভাই বড় ভাইএর নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছে।

অমর প্রভাতের কাঁধে হাত রেখে হাসলো, তারপর নিজের গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চললো। ট্যাক্সি প্রভাতকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বাইশ

খোলামেলা এলাকায় সাজানো একটা বাড়ী। খুবই মনোরম বাড়ীর সামনে ছোট লন, চারদিকে উঁচু গাছ তাদের ছায়ায় ছড়ানো ছিটানো বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ফুলের কেয়ারী। সন্ধ্যার আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রভাত লনে পায়চারী করতে থাকে। জীবনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি আজ তার সামনে মূর্তমান হয়ে ধরা দিয়েছে। আজ যদি অমর, মালা, মা, উত্তরা তার কাছে থাকতো তাহলে অসংকোচে সে সেইসব ছবিকে আপন করে নিতো কিন্তু এখন চেয়েও তা পারছে না। বাড়ীর আলো-ঝলমল স্মৃতি তাকে কাছে ডাকছে কিন্তু সে সেদিকে যেতে পারছে না। অতীতের স্মৃতি তাকে পিছু টানছে. আশে-পাশের সবকিছু হেসে হেসে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে কিন্তু সে স্পন্দনহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ সব যেন মিথ্যা। আলো, আহবান, আনন্দানুভূতি সবই যেন মিথ্যা, সবই যেন স্বপ্ন। সবাই স্বপ্নের সহচর। ওরা তাকে বিভ্রান্ত করতে এসেছে। কিন্তু সে সময় দীর্ঘায়িত হলো না। তাকে বিষণ্ন দেখে নতুন জীবনের সবকিছু নিমেষে তার দিকে এগিয়ে হাত ধরে টানছে। এখন সে ঝলমলকক্ষ আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্ন ভেঙে গেছে, বাস্তবতা সামনে এসেছে, সে বাস্তবতাকে আপন করে নিলো। স্বপ্নের জগৎ থেকে বেরিয়ে প্রভাত নিজের সাথে কথা বলতে লাগলো— এখানে একদিন মালা থাকবে, মা থাকবে। উত্তরাকেও সে নিয়ে আসবে। অমর আসেনি, সে আমার কথা শোনেনি, কিন্তু মায়ের কথা সে অবশ্যই শুনবে। মালার সামনে মায়ের অনুরোধ কিছুতেই সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। মালাকে আমার নিকট থেকে এখন আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। চৌধুরী রতন সিং এখন আর কোন অজুহাত দেখাতে পারবে না। মালা আমার, মালা প্রভাতের এটা সবাই জানে, সবাই আমাকে সাহায্য করবে। ওখানে আপন

জন খুব বেশী না থাকলেও স্মৃতি, স্বপ্ন, ধ্যান-ধারণা সবই রয়েছে। আর এখানেতো প্রত্যাশার সকল কিছুই বিদ্যমান।

সর্বপ্রথম নতুন ঠিকানা থেকে সে উত্তরাকে চিঠি লেখার কথা ভাবলো। তারপর লিখতে বসলো। আনন্দের আতিশয্যে তার বুক কাঁপছে, হাত কাঁপছে, দেহ কাঁপছে। তবু সে কম্পিত হাতে উত্তরাকে চিঠি লিখতে বসে গেল। চাকর এসে বলল, একজন সাহেব দেখা করতে চান। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রভাত বাইরে এগিয়ে দেখে অমর দাঁড়িয়ে আছে। প্রভাত তাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বলল, জিনিসপত্র কোথায়? আমি জানতাম তুমি আসবে। আর না এলে আমি আসতে বলতাম না।

অমর নীরবে হাসতে লাগলো।

জিনিসপত্র কোথায় ট্যাক্সিতে? প্রভাত বাইরের দিকে এগোলো।

অমর তার হাত ধরে বলল, আমি একাই এসেছি, জিনিসপত্র কিছু আনিনি। ভাবলাম একটা বাড়ীতে একাকী রয়েছো একটু দেখে আসি। কিন্তু তুমিতো চাকরও রেখে দিয়েছো। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করেছো।

হাঁ সব কিছু রয়েছে। চাকর, প্লেট, কাপ ইত্যাদি শকুন্তলা আগের দিনই দিয়ে গেছে। এখন ভেতরে চলো।

আমি অফিসের কাজে একটু বাইরে যাচ্ছি, পরে আসব।

ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে এসে দেখে যাও।

দিনের বেলায় আসব। রাতের আলো ছোট বেলা থেকেই আমার ভাল লাগে না।

অমর ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল।

চিঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে প্রভাত দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ তার চিঠির কথা মনে পড়লো। পিয়ন এসে একটু আগেই একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল। দেখেই বুঝলো উত্তরার চিঠি। সেখানেই দাঁড়িয়ে চিঠি খুলে পড়লো। উত্তরা লিখেছে, আনন্দের সাথে মালার বিয়ে হয়ে গেছে।

এতো আলো থাকা সত্ত্বেও প্রভাতের মনে হলো সে আস্তাবল মহল্লার অন্ধকারে ফিরে গেছে। সব আলো যেন দপ্ করে নিভে গেছে। ফুলের ঝাড় শুকিয়ে গেছে, বাড়ীর লনে উঁচু উঁচু গাছগুলো যেন ঘুরছে, যেন যে কোন সময় তারা ঢলে পড়তে পারে। দেয়ালে

হাত রেখে ধীরে ধীরে সে ড্রয়িং রূমে এলো। তার মনে হলো সব কিছু মরে গেছে, সব কিছু ঝিমিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু আগের বাসন্তী রং ফিকে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। অস্ফুটস্বরে সে কাঁদতে লাগলো ভাবলো এ সুসজ্জিত বাড়ী, বাগান কি-করব---আপনজনই যখন রইল না,কি হবে চারশ টাকা বেতনের চাকরি দিয়ে? যার জন্য চেয়েছিলাম সেই যখন নেই কার জন্য ভবিষ্যতকে নির্মাণ করব? কার জন্য এতো কিছু সহ্য করলাম?---খোলা আকাশের নীচে যেখানে সেখানে কার জন্য রাত কাটালাম? কার জন্য এতো কাঁদলাম? এই কি ভবিষ্যৎ এই কি অবস্থা, এই কি জীবন?

কিছু চিন্তা করার মতো সিদ্ধান্ত করার মতো অনুভূতিও ডুবে গেছে। এতো সংগ্রামের পর নিজের ঈপ্সিত ভুবন সে পেয়ে গিয়েছিল। আনন্দ কোলাহলে চারদিক ভরে উঠেছিল অথচ আজ সব ভেঙে চুরে ছত্রছান হয়ে গেছে। আর কখনো ফিরে আসবে না। তার দিকে উঁক দিয়ে দেখবে না। সে কাঁদবে, শুধু কাঁদবে, আঁচলে কখনোই অশ্রু মুছবে না। অন্ধকার পথে কখনো আলোর প্রদীপ জ্বালবে না। ঘুমিয়ে যাওয়া স্মৃতি, বিরান নির্জন একাকীত্বকে আর ডাকবে না---কখনো না।

সুসজ্জিত সুন্দর বাড়ীতে প্রভাতের জীবনের প্রথম রাতই ছিল বিষাদময়ী। অশ্রু-সাগরে ভেসে ভেসে তার মনে হলো মাথায় যেন কিছু নেই। আশে পাশে কেউ নেই, নিজের ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা করে সে অশ্রুপাত করছে। একটা শব্দ হলো---নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকে উঠলো---এ কেমন জীবন? যাকে চাইলাম যা চাইলাম কিছুই পেলাম না। এমতাবস্থায় পাথরের বুকও ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আবার মনে হলো মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে চিনতে পারলো। সেটা ছিল উত্তরার কণ্ঠ,---আমি অনেক কিছু চেয়েছি কিন্তু কি পেয়েছি?

মাথায় এবার বোধশক্তি ফিরে এলো। চোখে দৃষ্টি ফিরে এলো। কে যেন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। প্রভাত দেখে চিনতে পারলো, এ যে উত্তরার চাহনি।---আমি অনেক কিছু চেয়েছি কিন্তু কি পেয়েছি? কি পেয়েছি?

মাথায় একটা কান্নাকাতর শব্দ ধ্বনিত হলো।

নিজেরই কণ্ঠস্বর। সে চিনতে পারলো।

আমি জানি তুমি কিছু পাওনি, তুমি আমাকে শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছ, আমি তাও পারিনি। তোমার বোঝা হয়ে থেকেছি। কিন্তু আমি বাধ্য, উত্তরা আমি লাচার। এটা মনে রেখো, মালার কাছে যদি আমার শৈশব না থাকতো, কৈশোর না থাকতো, তোমাকে আমি সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করতাম। এখন এমন সময় এসেছে যে, মালার নিকট থেকে সবকিছু আমি ফিরে পেয়েছি। আমি এখন সেসব তোমার কাছে সমর্পণ করবো। তুমি গ্রহণ করবে?

যখনই আমি হতাশ হয়েছি তোমার কাছে পেয়েছি প্রত্যাশা। তুমি আমাকে কখনো হতাশ করোনি। চাঁদের মতো সব সময় আমাকে বিকিরণ করেছ।

প্রভাতের সুপ্ত বোধ হঠাৎ জেগে উঠলো। অন্ধকার কেটে গেল। কে যেন চোখের দৃষ্টির প্রদীপ জ্বেলে রাতের তিমির হনন করে নিয়েছে। কান্না কাতর চোখ নিমেষে হাসিতে ভরে উঠল। কে যেন হৃদয়-সঞ্জীবনী নিঃশ্বাস ফেলে বসন্ত জাগ্রত করে একাকিত্বের বেদনাকে সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভরে দিয়েছে।

হঠাৎ চিঠিতে লেখা উত্তরার নামে প্রভাত চুমু খেলো। উত্তরার চিঠিতে অশ্রু ভেজা কয়েকটি অস্পষ্ট প্রায় লাইনেও প্রভাত চুম্বন রেখা এঁকে দিল। সে লাইনগুলোতে উত্তরার হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছিল।

উত্তরার চিঠি ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে প্রভাত নিজেকে সম্বোধন করে বলল।

উত্তরা,

তুমিই আমার জন্য।

তুমিই আমার জীবন।

তুমিই আজ পর্যন্ত আমার জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছো।

তুমিই আমার জীবনের সান্ত্বনা, তুমিই আমার জীবনের আনন্দ।

আমরা দু'জন একে অন্যকে ছাড়া নিষ্প্রাণ, অসম্পূর্ণ।

তুমি আমার উত্তরা।

এবং

আমি তোমার প্রভাত।

জন্ম জন্মান্তরের সাক্ষী।

জন্ম জন্মান্তরের আপনজন।

প্রভাতের অশ্রুভেজা বেদনা হঠাৎ হাসির আলোয় চিকচিক করে উঠলো। কম্পিত ঠোঁটে সে উত্তরার নামোচ্চারণ করছিল। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে ছিল বিভোর। তার চোখে রঙ-বেরঙের দৃষ্টি। বসন্তের ফুলের মতো হেসে উঠলো সে এবং সে হাসি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। সে ফুলের রঙ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো, জ্যোৎস্নার ধবল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হলো।

প্রভাত উত্তরাকে, আপন জীবনকে, আপন ভবিষ্যৎকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো।

———